ভাবমুখে

আষাঢ় ● তেরশ' পঁচাশি ● দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • কটক • বাসবাস • পাটনা • শিলিগুড়ি • গৌহাটী

●

[illegible]

ORPHAN'S TEA

for

Health & Economy

[illegible]

[illegible]

Phone : 55-3704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণবাহুল্যে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত] মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CAL 6
PHONE : 34 - 5711

★

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪ - ৫৭১১

আষাঢ়
তৃতীয় সংখ্যা

মুক্তি সংঘ

দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ
তেরশ' পঁচাশি

গান	৬৩	শ্রীশ্রীঠাকুর
নিরপেক্ষ আনন্দ	৬৪	শ্রীঅর্চনাপুরী
চরণ শরণে	৬৫	শ্রীদিলীপকুমার রায়
প্রাণের প্রদীপ	৬৬	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
জীবন নদীর এপার ওপার	৬৭	শ্রীরাখালকৃষ্ণ আচার্য
এপারে মা ওপারে মা	৬৯	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক
শ্রুতিলিপি	৭০	কাজল নন্দী
ঋগ্বেদ সংহিতা	৭১	স্বামী নচিকেতানন্দ
হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব	৭৫	ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু
সাহিত্যে রূপকথা	৭৮	শ্রীমতী ছায়া মল্লিক
নীলমাধবের টানে	৭৯	যোগদাপুরী
সীমা আর অসীমা	৮১	স্বামী হীরানন্দ
কল্পনা	৮২	শ্রীশরণাপুরী
বিরহী	৮২	স্বামী মৃগানন্দ
তোকে ভালবাসি বলে	৮২	সুধেন্দু মল্লিক
শ্রবণ-মঙ্গলম্	৮৩	সাধনাপুরী
শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাপ্তি !	৮৬	ডাঃ নলীনা বসু
উদয় শঙ্খে বাজে তোমার জয়	৮৮	শান্তি দেবী

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনব ও অসামান্য নব সংযোজন

সাহিত্যের সীমানা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কবি ও কাব্য, সাহিত্যে ঈশ্বরতত্ত্ব—চরিত্রের, বিষয়ের, আদর্শের, ভাষার ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বের ভবিষ্যৎ, শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও কাব্যবিচার, অচিন্ত্যকুমারের কাব্যে ঈশ্বরানুভূতি, সাধক কবি সত্যানন্দের কবি প্রতিভা, প্রাণের কবি কুমুদরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি ও কাব্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সংকলন।

মূল্য : ১৫·০০ টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

নির্বাণ-ষটকম্/ভগবান শঙ্করাচার্য	৮৮	অনুবাদক : শ্রীতারাকুমার মিশ্র
শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্নের স্থান নির্ণয়	৮৯	শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ
আমাদের শীক্ষা পাঠ	৯০	মহিকেতা ভরদ্বাজ
ভক্তচারণ বৃন্দ	৯১	
অলোক অগম্য	৯১	মীরা রায়
পুণ্য পথ নাও	৯২	স্বামী অরূপানন্দ
গান ও স্বরলিপি	৯৩	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
World Psychology	15	Sreemat Swami Satyananda Deva
Book Review	16	S. Neelananda
The desire of the flute [English rendering of Sree Archana Puri's Bengali "Banshir Sadh"]	17	by Sri Jyotsnanath Mallik
Fundamentals of Shakta-Sadhana	18	S. N. Bagchi

With best Compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street

Calcutta—5

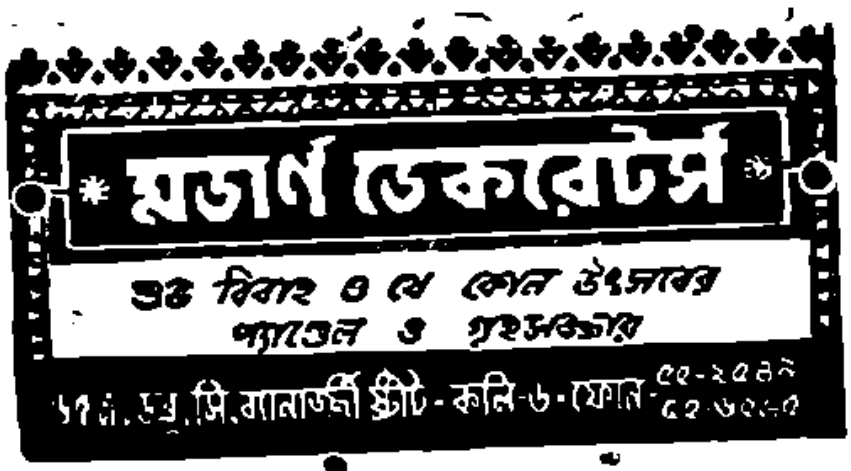

• আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : শ্রাবণ, ১৩৮৩

২০শে জুলাই, ৪ঠা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার = গুরু পূর্ণিমা।

২৭শে " ১১ই " বৃহস্পতিবার = সদ্গুরুপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের তিরোধান তিথি—আশ্রমবাসিগণ ও ভক্তগণ সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যথাসম্ভব মৌন ও উপবাসী থাকবেন সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হোমানুষ্ঠান হবে।

৩০শে জুলাই ১৪ই " রবিবার = একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।

৩রা আগষ্ট ১৮ই " বৃহস্পতিবার = অমাবস্যার হোম।

১৪ই " ৩০শে " মঙ্গলবার = একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম। আশ্রম বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন।

• বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM : DISWASHING

PHONE : Office : 24-1236
Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-16
Works : 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

করুণাবতার

শ্রীশরণাপুরী মূল্য : ১১·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি-৩৬

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA.
CALCUTTA-56

Phone : 55-1676

ফোন : ৫৪-৭৯৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৮৯ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : { ৩৫-৪১২৪
　　{ ৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

ALSO

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS

OF

ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

Head Office :
N. G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 42-5197

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah. (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ	তেরশ' পঁচাশি	আষাঢ়	তৃতীয় সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

আজি আরতি জীবন ছন্দে আজি আরতি সকল অঙ্গে
জীবনে আরতি মরণে আরতি আরতি নটন ভঙ্গে ॥
হোমের সমিধে আরতি জ্বালা কণ্টকে জড়ানো বেদনার মালা
জীবন পুড়িয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধূপ সুরভিতে বন্দে ॥
কড়ি ও কোমলে উথল বাদলে
দিশে দিশে আর হৃদি শতদলে
গদাধরে-প্রাণ বন্দে ॥

নিরপেক্ষ আনন্দ

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

আমার নিঃসঙ্গ প্রাণ
তোমাদের লক্ষ লক্ষ প্রাণের স্পন্দনে
শোনে এক অন্তহীন গান।

নিরপেক্ষ দৃষ্টি মাঝে টুকরো টুকরো বৈচিত্র্যের ছায়া
দিগন্তের অক্ষিপটে
মেঘরৌদ্র সম যেন হয়ে গেছে এক
ধ'রে এক পরিপূর্ণ কায়া।

এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি
হাসি অশ্রু সবই আছে—আছে কথা সুখ দুঃখ খেলা
তীরে বসে লক্ষ্য করা আসা চলে যাওয়া
তাই নিয়ে গেঁথে যাওয়া একখানি দিব্য গন্ধ মালা।

মাঝে মাঝে পথ চলা
ঝরণার সাথে সাথে উপল মাড়িয়ে
কিছু খোঁজা নয় ক্লান্তি রেখা কোথা আছে টানা
সবই দেখা শুধু যেন নিরুদ্দেশ হ'য়ে
উদ্দেশ্যের সার্থকতা জানা।

আসে জ্যোৎস্না ফুটন্ত ফুলের রাত
বৃক্ষে বৃক্ষে লতায় পাতায়
উৎসবের মুক্তাহারে নিত্য যেন স্বপ্নকে সাজায়।

তারি মাঝে বসে থাকি কাছে তবু দূরে—বহু দূরে
নির্ব্বিকার ইচ্ছা শুধু চেয়ে থাকে একান্ত অম্লান
ভেবোনা উদাস
আমার এ বিষণ্ণতা-তোমাদের লক্ষ লক্ষ
আনন্দের সাগর সঙ্গমে
নিত্য করে পূর্ণকুম্ভ স্নান।

চরণ-শরণে

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

ভেবে মেলে কূলকিনারা কবে ?
প্রশ্নাবর্ত, চিন্তায় হিজিবিজি
একের-পর-এক আসে মহোৎসবে,
মনঃক্ষোভে বলি কেবল : "ছি ছি।
কে বাগানে ফুল আকোটাই করিয়ে দিয়ে যায় ?
কার হুকুমে নিচুর রাত নামে অবেলায় ?"

মন বিচারক হ'য়ে টোপর পরে,
কিন্তু কাকে মারবে চাবুক হায় ?
দণ্ড দিতে চায় সে ভারম্বরে
দণ্ডধারীর চণ্ড গরিমায়।
একে ওকে তাকে দাগে "পাপিষ্ঠ পরম" !
স্বভাবে যে গরব কি হয় বিচারে নরম ?

অন্ধে বিষম ক্লান্ত হ'য়ে কাঁদে :
"কুলীন যে তার জন্ম-অধিকারে
জাত যায় তার কোন্ সে-অপরাধে,
জন্মের মুকুট পরেও কেন হারে—
একবার নয়, বারবার—'অভিজাত' যার উপাধি ?"
তাই সে শুধায় : "সত্তা শুধু হ'য়েও কেন কাঁদি ?

"একটি কেবল সান্ত্বনা—নই একা,
অনিচ্ছিতের খাতে সবাই পড়ে,
ভাবতে শিখেই আরো পেলাম দেখা—
কী অপরূপ আলো প্লাবন ঝড়ে :
কত শত ঈর্ষা নিদয় যায় হ'সে নিয়ত,
ধার্মিক নাগরিকেরা ভাঙে শুভব্রত।

"সবার উপর, ঘোর নিয়তির এই
দৈনিক অবিচারের দেওয়া হানা :
কোনো এজলাসেই যার আপীল নেই !

দুবি'ধানের মূল কার আছে জানা ?
যেদিকে চাই—কুরূপেরি বান ডেকে যায় যেন :
শিশুর বুকে আঁতুড়ঘরেও ঈর্ষা নামে কেন ?

কাল ছিল যা রূপবহুল উদার,
ধূলোমুঠিও হ'ত সোনামুঠি,
আজ কেন হয় মনে—কারাগার ?
কোন্ সুমতি ঘাতার এ-ভ্রূকুটি ?
এর নাম কি স্থায়ের আইন ? একটু আরাম বাসি,
তারপরেই হায় ঢেউ তুলে ধায় কান্না রাশি রাশি।"

গায় বাঁশি : "এ কেমন ব্যাকরণ ?
অক্ষর নেই, আছে সাহিত্য !
ফুল ফল নেই, আছে কাঁটাবন !
নেই কবি কেউ, আছে কবিত্ব !
যুক্তি বটে ! ভক্তি প্রেমের হাজার দেয়ালি রে,
জ্বালায় নি কি নিটোল আলো দোললীলা-মন্দিরে ?

"দিনে দিনে কতই বসন্ত
কমল উছল শতদলের শোভা…
কত সে গান, কত আনন্দ—
কত আবেশ স্বপ্ন হেমপ্রভা…
কত কী পাই যা ভুলে যাই—এমনি চপল মন :
ধ্যানের দিশা পায় নি যে তার হয় কি সুদর্শন ?

"সে দেখে—নেই কায়া, সবই ছায়া,
আকাশ আছে, নেই নীলিমার পাখা,
নেই চিত্র, আছে ছবির মায়া
সত্তা আছে, নেই রূপসী রাকা।
আছে স্নেহ প্রীতি, শুধু নেই আদরের বারি,
আছে ধূ ধূ মরু, শুধু নেই পিপাসার বারি।

"অসীম ব্যোমে উধাও ছুটিবার
নীহারিকার রথ, শুধু নেই চালক,
নাটক আছে, নেই নাটকার
জন্ম আছে নেই যাত্রা কি জনক।
সাধ্য আছে না,ও শুধু সাধের বাস্তবতা,
বিয়োগব্যথা আছে, শুধু মিলন রূপকথা।

"এক হ'তে চায় বহু সসৌরবে
ভগবানের এই তো সংবিধান,
ভগবানের নাগরদোলায় ভবে
দুলে ওঠে তাই ভক্তের প্রাণ।
সেই বিরাটের গহন মায়াজাল না কেটে কেউ
দেখতে কি পায় যায়েন যাওয়ার প্রাণোমিলার ঢেউ" ?

"অসীম অপার অতল অসংখ্য—
নয় নিরর্থ প্রলয় বিদ্বেষণ,
নয় বিরাটের স্পর্শ অলক্ষ্য,
সে তোর ব'লেই লীলা চিরন্তন।
তাই বিশ্বু পায় সিন্ধুর সালোক্য-সম্মান,
ধূলায় তারা নামে, কণায় মহৎ মহীয়ান্।

"একটু চেয়েই তাই যেন না খেমে
চাই তাকে যার স্পর্শের প্রসাদে
জীবন সফল হয়, সে প্রেমল নেমে
আসেন বৈষ্ণে সংঘাতে প্রমাদে।
তাঁর করুণায় স্বর্গতোরণ খুলবে অঘটনে,
প্রতি ছন্দে কাঁপবে তাঁরই আনন্দ নর্তনে।"

গায় বাঁশি : "নহে কল্পনা এ নয়,
এ-ই সত্যের মর্ম অবরুদ্ধ,
শরণ যে চায় হবেই রে তার জয়,
পাবেই দিব্যদৃষ্টির দর্শন,
দেখতে পাবি—সৃষ্টিলীলা চলেছে কোন্ মুখে,
অসাম বন্ধার উলু উল্লাসে,যুগে যুগে।

নয় বিচারে, সংশয়ে নয় নয়,
নয় বিজ্ঞানশক্তি-পরিমাপ,
প্রাণের নতিই নহুকে করে হয়,
আত্মসমর্পণের প্রার্থনায়।
তাকে তাকে তাই : দাও আমাকে হে ভুবনেশ্বর,
বিচারমতির নয়— শরণাগতির পরম বর।"

দিল্লী ৩. ১১. ৭১.

★

প্রাণের প্রদীপ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

মনের আঙন জেলে প্রাণের প্রদীপ
প্রতিদিন প্রতিকাজে সে শিখার শিব।
কল্যাণ মাধুরী আনে
অজস্র ধারার গানে
জীবনের বীজ থেকে মহীরুহ জীব।

ফুলে ফলে সবুজের সমারোহ ছল
নানা জন নানা ভাবে উপভোগী বল।
সাগরের নীলজলা
তোলপাড়ে উচ্ছলা—
সবটুকু নয় নয়, জানে স্থির ধীর।

জীবন নদীর এপার ওপার

শ্রীরাখাল কৃষ্ণ আচার্য

বিশাল এক নদী এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। দিগন্ত সীমায় যেখানে আকাশ আর জলে মিশে গেছে সেখানে চোখে পড়ে একটা কুয়াশার রেখা। এপারটা আমাদের কাছে অতি সুস্পষ্ট ও বাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু ওপারটা তা নয়।

এপারে ইহলোকের জীবন, আর ওপারে পরলোকের জীবন। আমাদের ক্ষুদ্র দেহ—তরীখানা বারবার এপার ওপার পাড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে যুগযুগান্তর ধরে।

আমাদের কাছে এপারের পার্থিব জীবনকে সত্য বলে মনে হয়, কারণ এপারের সবকিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু ওপারকে তা পারিনা বলে তাকে অস্পষ্ট কুয়াশা ঢাকা এক বিরাট রহস্য বলে মনে হয়। অনেকে ওপারের অর্থাৎ পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, যা চোখে দেখতে পাইনা, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ইহলোকই সব, পরলোক বলে কিছু নেই। মৃত্যুতে মানুষের সবকিছু ধ্বংস হয়; তাই মৃত্যুর পর মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

পরলোক সম্বন্ধে এই সংশয় আজকের নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তারই আভাষ রয়েছে কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রশ্নে—"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে"—কেউ কেউ বলেন মানুষ মরলে চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যায়, আর কেউ কেউ বলেন মরণের পরও মানুষ বেঁচে থাকে। এই কথা দুটির কোনটি সত্য? এই প্রশ্ন আমাদের মনে সন্দেহ জাগায় (১)।

উপনিষদের যুগ থেকে মানব সভ্যতা আজ অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও নচিকেতার সেই প্রাচীন প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর বিজ্ঞানের দিক থেকে আজও মেলেনি। বিজ্ঞানের দিক থেকে বলছি এইজন্যে যে আধুনিক যুগে আমরা সবকিছু বিজ্ঞানের আলোতে দেখতে অভ্যস্ত। যার পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন নেই তাকে স্বীকৃতি দিতে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু আমরা ভুলে যাই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা।

আমাদের এপারের জীবনটা কি, বিজ্ঞানের কাছে তারই কি কোন হদিশ পাওয়া যায়? জীবনবিজ্ঞানের পুস্তকে জীবন আসলে কি, তার কোন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। সেখানে দেখা যায়, জীবন একটা রহস্য —"লাইফ ইজ এ মিষ্ট্রি"। জীবনক্রিয়া বা জীবনের বহিঃপ্রকাশকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু জীবনের আসলরূপ অথবা মূল ভিত্তি যা থেকে হয়েছে জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ, সে বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান বেশী আলোকপাত করতে পারেনি।

ওপারের জীবন তো দূরের কথা, এপারের জীবনের আদি এবং অন্ত, জন্মপূর্ব এবং মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান কোন খবর দিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের এই অক্ষমতা বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন,

"Modern Science knows nothing about a before-life or an after-life of the human Soul, knows nothing about a soul at all." (২)

জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তের সন্ধান পেতে হলে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় নয়, কেবলমাত্র ভারতীয় চিন্তাধারার যে স্বাক্ষর রয়েছে উপনিষদ, বেদান্ত, সাংখ্য—পাতঞ্জলে তারই আলোকে পাওয়া সম্ভব। প্রাচীন হিন্দু ঋষি ও চিন্তাবিদ্‌গণ তাঁদের ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে এপার ওপার, ইহলোক-পরলোক, জীবন মৃত্যু, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে

যে সত্য আবিষ্কার করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা আজও লুপ্ত প্রমাণিত হয়নি ; বরং তারই সামান্য কিছু, মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে পাশ্চাত্য দেশের আত্মিক গবেষণা (সাইকিক্যাল রিসার্চ) সমিতি নূতন করে আবিষ্কার করেছে। প্রাচীন হিন্দুদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্তব্য স্মর্তব্য :

"The Hindus are the only people today who from time immemorial have studied the spiritual side, and have recorded the result, and have left their knowledge, which have been handed down to us through generations. There is no other nation in the world, which has so perfect a knowledge in these lines, as we have in India." (৩)

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণ জীবনের বহিঃপ্রকাশকে সমগ্রজীবন বলে মনে করেননি। তাঁরা একথা স্বীকার করেন না যে, মানবজীবন কালমাত্রার এক নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপর একটি বিন্দুতে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, তাঁরা মনে করেন জীবন অনন্ত প্রবাহ। তাঁরা সর্বত্র খোঁজ করেছেন জীবন প্রবাহের মূল ভিত্তি বা কেন্দ্রবিন্দুকে।

শ্রীঅরবিন্দ "ইণ্ডিয়ান কন্‌সেপ্‌শন্ অফ্ লাইফ" নিবন্ধে জীবন সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ধারণার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করে বলেছেন, জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তা-দৃষ্টি একটি গভীর কেন্দ্র হতে আরম্ভ হয়ে বাইরের দিকে এগিয়ে গেছে। ভারতীয় চিন্তা-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এই যে তা সর্বত্র আত্মাকে খুঁজে বেড়ায়। (৪)

কেন এই অন্বেষণ ? কারণ মানবজীবনের গভীরতর কেন্দ্র হচ্ছে আত্মা এবং আত্মাই জীবনের ভিত্তি। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের মতে, "প্রত্যেকটি ব্যক্তি—আত্মাই জীবনের কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্র অমর"। (৫) আত্মাকে বাদ দিয়ে জীবনকে পুরোপুরি মানা সম্ভব নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; অবশ্য কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, আত্মাই মানবব্যক্তিত্বের মূল কেন্দ্র। সি, ই, এম্, জোয়াড মনে করেন যে হিন্দুরা যাকে আত্মা বলেন সেই আত্মাই হচ্ছে মানবব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মা পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করে। তিনি বলেছেন :

"The spirit is the seat of personality. In fulfilment of a purpose it is incarnated in a body or perhaps, in a number of successive bodies. The spirit so conceived is analogous to what the Hindus call the Atman." (৬).

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে পরামনোবিজ্ঞান (প্যারাসাইকোলজি) মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষের ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণার আলোকে মানবব্যক্তিত্বে একটি শাশ্বত সত্তা বা আত্মার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে যে, আত্মাই মানবব্যক্তিত্বের কেন্দ্রস্থল। পরামনোবিজ্ঞানের এই স্বীকৃতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরামনোবিজ্ঞানের জাতিস্মর তত্ত্বের (Extra Cerebral Memory সংক্ষেপে E.C.M.) গবেষণায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাদের জাতিস্মর বলা হয় তারা পূর্বজন্মের অনেক ঘটনা স্মরণ করতে পারে। এই ক্ষমতা অতিশয় দুর্লভ হলেও শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের বহু দেশে নানা বর্ণের মানুষের মধ্যে জাতিস্মরদের খোঁজ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে এ নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়নি। পরামনোবিজ্ঞানীরা জাতিস্মরদের কথিত তাদের পূর্বজন্মের কাহিনীগুলির সত্যতা বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন যে, মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংস হয় না এবং একই আত্মা বারবার জন্মগ্রহণ করতে পারে (৭)। পরামনোবিজ্ঞানের এই গবেষণা থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মূল প্রাচীন তত্ত্ব পূর্বজন্মবাদের সত্যতা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমর্থন পাওয়া যায়।

মানবআত্মাকে কেন বার বার জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় ? এ বিষয়ে দার্শনিক এল. রাবাস্কান বলেন,

'আমাদের এখানকার জীবন একটি বৃহত্তর জীবনের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়, যার ভিতর রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রবৎ আবর্তন। কারণ মানবাত্মার পূর্ণতা লাভের জন্য এক জন্মই যথেষ্ট নয়, তার জন্য বহুবার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। মৃত্যু জীবনেরই একটি প্রক্রিয়া ; এছাড়া মৃত্যুর আর কোনো অর্থ নেই। মৃত্যু বলতে জীবনের অস্বীকৃতি বোঝায় না' (৮)।

পরামনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, দেশ-কালের বিশ্বে থেমে যাওয়া আর মরণোত্তর অস্তিত্ব বা অমরত্ব বলতে বুঝায় দেশ কালের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। (৯) কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গণ মনে করেন মৃত্যু বলতে ঠিক থেমে যাওয়া নয়, বরং ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মজগতের দিকে নূতন দেহে—সূক্ষ্ম দেহে আরও এগিয়ে যাওয়া। সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করার প্রথম শর্ত হল, জড়দেহটা জড় জগতে রেখে যেতে হয় ; এর নাম দেহত্যাগ বা মৃত্যু।

'মৃত্যু' কথাটা প্রায় সকলের কাছেই আতঙ্কজনক। কারণ মৃত্যু বলতে মানবব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বলে মনে করা হয়। অনেক মনীষি ব্যক্তি এই সার্বজনীন ভুল ভাঙাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, সাধারণ লোক মৃত্যুকে ভয় করে। এই ভয় অজ্ঞতাপ্রসূত ; কারণ তারা জানেনা মৃত্যুর অর্থ আর মৃত্যুর পর তাদের কি ঘটবে। মৃত্যু বলতে ধ্বংস বা সম্পূর্ণ অবলুপ্তি বুঝায় না ; মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন (১০)। তিনি আরও বলেছেন, বেদান্ত বলে মৃত্যু হলে মানুষ সত্যি সত্যি মরে না, চৈতন্যের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়। সে সময়ে আত্মা তার জড়দেহটা জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে (১১)। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'কোনো মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জীবাত্মার কিন্তু মৃত্যু হয় না। জীবাত্মা সূক্ষ্ম আকারে অদৃশ্যভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকে' (১২)।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "অধ্যাত্ম জীবনের পথিকের নিকট মৃত্যু এক জীবন হতে অন্য জীবনে যাবার যাত্রাপথ মাত্র—কেউই মরে না, কেবলমাত্র নিকট হতে দূরে যায়।.....মৃত্যুতে কেবলমাত্র শরীর ত্যাগ হয়—ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অবসান ঘটেনা—এ যেন মানুষের অন্য দেশে যাওয়া ও সেই দেশের আবহাওয়ার উপযোগী পরিচ্ছদ বদল করা।" (ক্রমশঃ)

———

এপারে মা ওপারে মা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

এপারে মা ওপারে মা মাঝখানেতে জল,
এপারে মা ডাক দিয়েছে ওপারেতে চল।
হাত ধরে মা আসিয়ে চলে ওপারে চোখ রাখি,
হেসে খেলে ঢেউ ভেঙে যাই, অনেক দূর ত' বাকী
সকাল বিকাল রাঙা জলে, কালো আঁধার হলে
ওপারে মার কালো চুলে উঠছে তারা জ্বলে।
ডুবলো রবি উঠলো না চাঁদ অথা অন্ধরাতি,
মায়ের চোখে বিজলী বলক তাই হয়েছে বাতি।
পিছলে পড়ি, কঠিন মুঠি, 'আগিয়ে চলো' মুখে,
অভয় পদ শরণ নিয়ে চলছি মনের সুখে।
কালো জলে রাঙা কমল ফুটছে মায়ের পায়ে,
হঠাৎ দেখি ওপারের মা গেল নিকট হয়ে।
অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি দু মায়ের মুখ এক,
ওপারের মা এপার এসে আমায় দিল ডাক।

শ্রুতিলিপি

কাজল নন্দী

ঠাকুরের সন্তান আমাদের আনন্দদা মুক্তো মাকে ছোটবেলায় খুব রাগাতেন। সর্বদাই বলতেন, "আর তোকে দীক্ষা দিয়ে দি।" মুক্তো মা কানে আঙুল দিয়ে ভয়ে কান্নায় অস্থির, কারণ ঠাকুরের কাছ ছাড়া আর কারও কাছে দীক্ষা নেবেন না। আনন্দদাও ছাড়বেন না, মজা করবেন, বললেন—"কান থেকে হাত সরা, বল—ওং কট"। শোনামাত্রই আবার কান্না। কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরের কাছে এসে "ও ঠাকুর, আমার দীক্ষা হয়ে গেল। ঠাকুর, আর আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিতে পারব না।" ঠাকুরও হাসতে হাসতে বলেন, "কে তোকে দীক্ষা দিল, কে তোর গুরু হল ?" কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন—"আনন্দদা", বললেন—"ওং কট"।

সেই থেকে আনন্দদা মুক্তো মাকে দেখলেই বলতেন ওং কট। আর শুরু হত সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে চীৎকার। কোনও সময় হয়তো একটি ভাল ফুল নিয়ে এসেছেন ঠাকুরদের জন্য, আনন্দদা ধরলেন, "এই কোথায় চলেছিস, আমাকে পুজো কর, আমি তোর গুরু।" মুক্তো মা বলছেন—"একটু বড় হলেই বলতাম 'ঠাকুরকে বলে দেব' অবশ্য তাও ভয়ে ভয়ে।"

কোনও এক জায়গায় শ্রীঠাকুর তাঁর দলবল নিয়ে গেছেন। মাঠের মাঝে একটি বড় গর্ত পড়েছে, ঠাকুর সেটিকে লাফিয়ে পেরিয়ে গেলেন। ঠাকুর যেহেতু পেরেছেন অতএব আমরা সবাই পারবো এই ভেবে ঠাকুরের কন্যা শ্রী গীতা মা প্রথমে লাফিয়েছেন। কিন্তু ভাল সামলাতে না পেরে তিনি পড়লেন কাঁচা মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ছোট মেয়ে লাফাতে গিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ে। খুব ফর্সা ধবধবে ঠাকুরের কন্যাটিকে পড়ে যেতে দেখে সকলে চীৎকার শুরু করেছে, একটা বালিশ পড়েছে, একটা বালিশ পড়েছে। সকলের হাততালি ও হাসির চোটে গীতা মা রেগেই অস্থির। আর উঠেই শুরু করেছেন ঠাকুরের আর একটি ছোট মেয়ে মীরা মাকে মারতে। "তোর জন্যই তো আমি পড়লাম," বলছেন আর মেরে যাচ্ছেন। মীরা মা বলছেন—"বা রে তুই তো আগে পড়লি তবে তো আমি পড়লাম।" কিন্তু রাগে ও লজ্জায় নিজের দোষটা তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন।

শ্রীঠাকুর অসময়ে ঘুমানো পছন্দ করতেন না। একবার পূর্ণশশী মা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গীতা মা সতর্ক থাকতেন এই ব্যাপারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোঙ্ক এঁকে দিয়েছেন। বিকালে পূর্ণশশী মাকে দেখে ঠাকুরও হাসছেন আর ঠাকুরের ছেলে মেয়েরাও হাসছেন। হাসির কারণ কিছু বুঝতে না পেরে সেই মাটিও হেসে চলেছেন।

আর একদিন মুক্তো মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, গীতা মাও তাঁর কাজ করে দিয়েছেন। কারণ এইভাবে ঠাকুরের কাছে রিপোর্ট চলে যাবে ধ্যানের বদলে দুপুরে ঘুম হয়েছে। ঠাকুরের সামনে উপস্থিত হতেই ঠাকুর ও তাঁর সাথীরা হাসতে থাকেন। মুক্তো মা সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সঙ্গীদের বলছেন—"হাসছিস কেন রে ?" ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বলেন, 'আয়নায় নিজের মুখটা দেখে এসো।'

আর একদিন দুপুরে গীতা মা শুয়ে শুয়ে শ্রীঠাকুরকে স্মরণ করছেন। মুক্তো মা, "এই সুযোগ, আজ গীতাকে জব্দ করব।" তেল কালি যেই লাগাতে এসেছেন গীতা মা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বরে—'উহুঁ' সাড়া পাওয়া মাত্রই —"ও তুই জেগে আছিস," বলেই ছুটে পালিয়ে গেলেন।

———

ঋগ্বেদ সংহিতা

স্বামী সচ্চিদানন্দ

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি। ২য় মন্ত্র।

পদবিভাগ :—অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ নূতনৈঃ উত সঃ দেবান্ আ ইহ বক্ষতি।

অন্বয় :—অগ্নিঃ (অগ্নি) পূর্বেভিঃ (পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রাচীন) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) উত (এবং) নূতনৈঃ (আধুনিক ঋষিগণ কর্তৃক) ঈড্যঃ (পূজ্য বা পূজনীয়)। সঃ (তিনি) দেবান্ (দেবগণকে) ইহ (এখানে) আ বক্ষতি (লইয়া আসুন)।

পদ্যানুবাদ :—
স্তুত হয়েছেন অগ্নি সকল প্রাচীন ঋষির দ্বারা।
নবীন ঋষিও গেয়ে চলেছেন যিনি সে প্রাচীন ধারা।
সেই সে অগ্নি ডাকিয়া আনুন সকল দেবেরে হেথা—

অগ্নি :—অগ্নি শব্দ লইয়া বিস্তৃত বিচার প্রথম মন্ত্রে করা হইয়াছে।

পূর্বেভি :—প্রাচীনগণকর্তৃক। পূর্ব শব্দের ওয়ার বহুবচন। বৈদিক সংস্কৃত ভিন্ন অন্যস্থলে পূর্বৈঃ হয়। পূর্ব + অন্। পূর্বতিধাতোরন্ প্রত্যয় ঔনাদিকঃ—সা.।

ঋষিভি :—ঋষিগণকর্তৃক। দৃশ্ + ইন্ = ঋষিঃ। 'অন্তরূক' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ। (সর্বধাতুভ্য ইন্—উ.৪৫৭। ইন্প্রত্যয়ান্ত ঋষিশব্দঃ অন্তর্ভূতেতি নিপাতনাৎ—সা.; পা. ৪/১/১১৪)। আচার্য ঔপমন্যবের মত উদ্ধৃত করিয়া নিরুক্তকার বলিয়াছেন স্তোম অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্র সমূহের দর্শন পাইয়াছেন বলিয়া ঋষি। (ঋষির্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যৌপমন্যবঃ—নি. ২/১১)। ধাতুপাঠে তুদাদিগণীয় 'ঋষি' ধাতুর অর্থ গমন করা হইয়াছে। (ঋষীগতৌ—ধাতুপাঠ ১২৮৮)। পুরুষেরা বেদ বা জ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট বেদপুরুষ স্বয়ম্ভূ উপস্থিত হইলেন বা গমন করিলেন। যাঁহাদের নিকট গমন করিলেন, তাঁহারাই ঋষি। (বেদপ্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভূর্বেদ-পুরুষঃ প্রাপ্তোৎ—সা.)। নিরুক্তকারও বলিয়াছেন যেহেতু স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তপস্যানিরত ব্রাহ্মণগণের নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা ঋষি হইয়াছিলেন। ইহাই ঋষিদিগের ঋষিত্ব। যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূঃ অভ্যানর্ষৎ তে ঋষয়োঽভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বমিতি বিজায়তে—নি ২/১১। অভ্যান্ হ বৈ পূর্বীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূত্যানর্ষত্ ঋষয়োঽভবংস্তদৃষীণামৃষিত্বম্—তৈ. আ. ২/৯/১)। সায়নাচার্যের মতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণ প্রপাঠকে ইহার উল্লেখ আছে। স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইবার জন্য বোধ হয় ঐ প্রপাঠকে স্বাধ্যায়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। (অত্র প্রপাঠকস্য স্বাধ্যায় ব্রাহ্মণমিতি সমাখ্যানাৎ স্বাধ্যায় এবাত্র প্রাধান্যেন বিধেয়ঃ—সা. ৮০)। বলাবাহুল্য এই ব্রাহ্মণগণ আমাদের মত কল্পমধ্যে বার বার জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাই তাঁহারা অজ এবং তাঁহারা পৃশ্নি অর্থাৎ দুগ্ধকায় ছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ নির্মল থাকায় তপস্যায় নিরত হইলে তাঁহাদের নিকট বেদপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন না করিয়াও তপোবলে তাঁহারা সমগ্র বেদস্বরূপতঃ দর্শন করিয়াছিলেন। এই দর্শনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য ঋষিগণের ঋষিত্ব। (কল্পাদাবেব ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা ন হ্যন্যাদিবৎ কল্পমধ্যে পুনঃ পুনর্জায়ন্তে তস্মাদৃগাঃ তে চ পৃশ্নয়ঃ স্বরূপেনৈব নির্মলাঃ সন্তোঽপি পুনস্তপ আচরন্—সা.। অনধীত্যৈব তস্মাত্তো বদৃগুত্তপোবিশেষেণ—দুঃ)। ইন্দ্রিয়াতীত বেদকে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা প্রথমে দেখেন তাই তাঁহারা ঋষি। ইতিহাসের সহিত বেদ যুগান্তে অন্তর্হিত হইয়া

পিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ তৎসাক্ষাৎকৃত মন্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণের পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। (অতীন্দ্রিয়ে বেদস্য পরমেশ্বরাদ্যুপদেশে প্রথমতো দর্শনানুবিধায়কত্বাদ্ ব্রাহ্মণস্য—দুর্গাচার্য। ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ব্রাহ্মণানি তু তদুপদেষ্টারঃ—সা.)।

ঋষ্ ধাতুর অর্থ গতি। গত্যর্থক ঋষ্ ধাতুর সহিত সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ বেদ স্বয়ং ঋষিদের নিকট সমাগত হওয়ায় ইহাই ঋষিগণের ঋষিত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। (ঋষির্যাথার্থ্যবিবরণাদ্বিপরোক্ষতশ্চ—সা.)।

অতএব ঋষি শব্দের দুইটি বুৎপত্তি হইল। নৃশ্+ইন্=ঋষি এবং ঋষ্+ইন্—ঋষি।

ঈড্যঃ পূজ্য, বন্দনীয়—। ঈড্+ণ্যৎ 'ঈড্যশ্চ বন্দিতব্যো' :—নি. ৭ম ও ৮ম অঃ—১০।

নূতনৈঃ—নিরুক্তকার নবম্, নূত্নম্, নূতনম্, নবাম্, ইদা ও ইদানীম্ এই ছয়টি নব শব্দের সমার্থক বলেন (নবম্ নূত্নম্ নূতনম্ নবাম্ ইদা ইদানীম্ ইতি নবস্য নবনামানি (নিরু. ৩/২৮)। অধিকন্তু তিনি এস্থলে নূতন শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'নবতর', বলিতেছেন 'নূতনৈঃ ঈড্যঃ' অর্থাৎ আমাদিগের মত নবতর ঋষিগণ দ্বারা যিনি বন্দনীয়। (অস্মাভিশ্চ নবতরৈঃ ঈড্যিতব্যঃ নি. ৭।। নূতন=নব+তনপ্। নব শব্দের উত্তর ত্ন, তনপ্, ও ত এই তিনটি প্রত্যয় হইলে নব শব্দের স্থলে নূ আদেশ হয় বলিয়াছেন বার্ত্তিককার কাত্যায়ন (নবস্য নূ আদেশো ত্ন তনপ্ ত্রাশ্চ প্রত্যয়া বক্তব্যাঃ—বা. ৬৪২৭)। যাস্কাচার্য 'পূর্বেভিঃ' এবং 'নূতনৈঃ' এই দুই শব্দের দ্বারা ঋষিদিগকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ববর্তী ঋষিরা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগের ঋষিগণ ধর্মের দ্রষ্টা ছিলেন না। তাঁহাদিগকে পূর্ববর্তী ঋষিরা উপদেশের দ্বারা মন্ত্রসমূহ দান করিয়াছিলেন। (সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মেভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সংপ্রাদুঃ—নি. ১/২০)।

উত—বৈদিক অব্যয়। অর্থ ও, এবং। (উত ত্বঃ পশ্যন্নঃ—নি ১; উত বা অপি বা—নি. ৬ (ছয়); উতান্তঃ অপ্যন্তঃ—নি. ১২।। দুর্গাচার্যের মতে উত, অপি ও অথ এই তিনটি বেদে একই অর্থ প্রকাশ করে। অন্যত্র দুর্গাচার্য উত এবং অপি শব্দ সমানার্থক বলিয়াছেন। (উত অপি অথেতি ছন্দসি সমানার্থাঃ- দু. ১/৬; উত শব্দোঽপিশব্দেন সমানার্থঃ—দু. ১/১৯।। স্কন্দস্বামীর মতে অপি এবং এব (ই) এই দুই অর্থে উত শব্দের প্রয়োগ হয়। উতশব্দোঽপ্যর্থে—স্ক. স্বা. ১/৬; উত এবার্থে—স্ক. স্বা. ৪/২৫)।

দেবান্—প্রথম মন্ত্রে দেবম্ শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেব শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচনে দেবান্ হয়। সন্ধির জন্য ন স্থলে ণ হইয়াছে।

ইহ—এখানে। আ+ইহ। বেদে 'আ' উপসর্গ সামীপ্য অর্থ বোঝায়। নিরুক্তকার বলিয়াছেন 'আ' শব্দের অর্থ অর্বাক্। স্কন্দস্বামী অর্বাক্ শব্দে সংক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। ('আ' ইত্যুর্বাগর্থে—নি. ১/৪ ··· অর্বাগর্থঃ সংক্ষিপ্তঃ—স্ক. স্বা.) উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসে। (তে প্রাগ্ধাতোঃ—পা. ১/৪/৮০)। কিন্তু বেদে কখনও কখনও উপসর্গ এবং ধাতুর মধ্যে অন্য শব্দ থাকিতে পারে। 'ব্যবহিতাশ্চ'—পা. ১/৪/৮২)। 'ইহ' বৈদিক অব্যয় 'ইদম্' শব্দের সপ্তমী স্থানে হ প্রত্যয় হয়। (ইদমো হঃ—পা. ৫।৩।১১)।

বক্ষতি—বহ্ ধাতু+লৃট্ (সেই এর রূপ বা লোটের অর্থে) সায়নাচার্য্যের মতে বেদে এইরূপ হয়। (বহতি ধাতোর্লোডর্থে ছান্দসো লৃট্।···যথা লেটি···· (সা.)। পাওয়াইয়া দেওয়া বা আনয়ন করা অর্থে বহ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়। 'আবক্ষতি' অর্থ 'আবক্ষতু' অর্থাৎ আনয়ন করুন। (আবক্ষতি ইহ প্রাপণ ইতি ধাতুঃ আবহবিভাগার্থঃ সা; এহ বক্ষতি ইহাবহবিধিঃ—নি. ৭।১৬; এহ বক্ষতি=আ+ইহ বক্ষতি=ইহ+আবক্ষতি=ইহ আবহতু (এই স্থানে অর্থাৎ এই যজ্ঞে আনয়ন করুন)।

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু

(অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন মার্গের সমন্বয়

এই পুস্তিকার প্রারম্ভ হইতে ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সংস্থাপিত করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ মানুষ তাহার জৈবিক দেহের সঙ্কীর্ণতা ও কামনার নাগপাশে বদ্ধ থাকিবে ততক্ষণ অসীমের সহিত মিলিত হইবার কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র। নিজকে দৈহিক কারাগার হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেবত্বে আরোহণ না করা পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব ১? সমগ্র হিন্দুধর্মই হইতেছে, পশুত্ব হইতে দেবত্বে উত্তরণের উপায় আবিষ্কারের নিরন্তর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

অবশ্য, একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ঋষি, সাধক এবং শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু এই সবগুলি পথেরই গন্তব্যস্থল এক ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে হিন্দুধর্মের এই সকল আপাত বিরোধী পন্থা ও মতবাদ সমূহের মধ্যে সমুদয় বিভেদ অন্তর্হিত হইবে।

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টির কারণগুলি আমরা প্রথম অধ্যায়েই বিবৃত করিয়াছি। প্রধান কারণ দুইটি—(ক) ধর্মচিন্তার স্বাধীনতা ও (খ) অধিকার বাদ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে জন্মগত বৈষম্য অনস্বীকার্য্য; সুতরাং সকল মানুষের জন্য এবং সর্বস্তরে, একই ব্যবস্থা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। বৃদ্ধের উপযোগী পথ্য শিশুর উপর চাপাইয়া দিলে তাহার জীবন হানি হওয়াও বিচিত্র নহে। ইহা ব্যতীত, যে তত্ত্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে বা বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষ নহে, পরন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়, সেই বিষয়ে কোনও এক ব্যক্তির মতবাদকেই একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার করাকে চরম ধর্মান্ধতা ছাড়া আর কি বলা যায়? হিন্দু ঋষিগণ তাহা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের ব্যর্থতা বা কল্পনা বিলাস নহে,—অতীন্দ্রিয় জগতে প্রত্যেকের স্বাধীন গবেষণা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, এবং এই অভূতপূর্ব স্বাধীনতার সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে বিভিন্ন যুগের বহুবিধ পন্থাবলম্বী নিরীক্ষায় তাঁহারা একই লক্ষ্যে, একই গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছেন।

হিন্দুধর্মে মত ও পথ বহুবিধ হইলেও দিক্ নির্দেশক বস্তু মাত্র দুইটি বলা চলে—প্রবর্তক ও নিবর্তক, বা প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তি মার্গ।২ বর্তমান আলোচনায় কিছু দূর অগ্রসর হইলেই আমরা দেখিব যে, এই দুইটি মার্গের মধ্যে চরম বিরোধ কিছু নাই, কারণ দুই এরই গন্তব্যস্থল এক, কেবলমাত্র অধিকার ভেদে বা আধ্যাত্মিক বিকাশের স্তরভেদে তাহাদের অনুশাসনের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রারম্ভে, তাহার প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী, এই দুইটির কোন্ পথে তাহার যাত্রা পরিচালিত হইবে তাহা স্থির হইয়া যায়। যদি নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ মার্গের কর্মসূচী পালন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দিন শেষে দেখা যাইবে যে, এই দুইটি ভিন্ন মার্গের পথিকদ্বয় একই লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহাদের কার্য্যক্রমও অভিন্ন।

আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে তমসাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে প্রকৃতির মায়া বা অবিদ্যা ৩। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান তাই, আমাদিগকে অমৃতত্ব হইতে

১। বৃ (৪।৪।৬)—'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'।

২। ম (১২।৮৮)— 'প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্'।

বর্ধিত করিয়া, অনিত্য দেহ এবং তদ্ভোগিক অনিত্য এই দেহের ভোগোপকরণ সমূহে আসক্ত রাখিয়াছে, এবং সেই আসক্তিই আমাদের জন্ম মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ করিয়া নিরন্তর রোগ-শোক-জরা প্রভৃতি অপার দুঃখের কারণ হইতেছে।[৩] অতএব সহজেই অনুমেয় যে প্রকৃতিকে জয় করিতে পারিলেই আমাদের সকল দুঃখের নিরসন, এবং আমাদের এষণা সম্পাদনের পথের সকল বাধা দূর হইতে পারে। হিন্দুধর্ম তাই প্রথম পাঠেই প্রকৃতি জয়ের জন্য দুইটি বিকল্প সমাধানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

(ক) প্রথম পথটি সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য—আমরা যদি ক্ষুধা-ব্যাধি-জরা (সম্ভব হইলে মৃত্যু) প্রভৃতিকে দূর করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারি তাহা হইলে প্রকৃতি আমাদের আর কি দুঃখ দিতে পারিবে? কিন্তু প্রকৃতিজ সকল আধিব্যাধি নিবারণ করিতে হইলে চাই অসীম শক্তি, ঐশ্বর্য, বাস্তব বিদ্যার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

প্রবৃত্তি মার্গে তাই কামনা ও কর্মের প্রাচুর্য আছে। নিজের চেষ্টায় সব সম্ভব নহে বলিয়া স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করিতে হয় এবং এই 'দেহি দেহি' প্রার্থনার পরাকাষ্ঠা পাই আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অর্গলাস্তোত্রে—যেখানে মানুষের ঐহিক অভ্যুদয়, সুখ ও বিপদ্ নিবারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন কল্পনা করা যায়, সবই জগজ্জননী চণ্ডিকার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—রূপ, জয়, যশঃ, শ্রী, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ ইত্যাদি। বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিও প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্গত।[৪]

এই মার্গে মানুষ সৎ বা পুণ্য কর্ম করিবে—ঐহিক সুখের জন্য তো বটেই, মৃত্যুর পরও স্বর্গ সুখ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। যে বিদ্যার দ্বারা মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না, এইরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনাকেও প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কারণ এই সকল বিদ্যাচর্চার স্বর্গলাভ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না। অতএব 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা যে জ্ঞান লাভ করিলে অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যাইবে, তাহাকে 'পরা' বিদ্যা; এবং বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এর পাঠ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে 'অপরা' বিদ্যা বলা হইয়াছে[৫]।

এইরূপে লোক কল্যাণের জন্য যজ্ঞাদি, দান বৃক্ষরোপণ, তড়াগাদি খনন, পান্থনিবাস নির্মাণাদি সুকৃতকর্মের দ্বারা দেহান্তে স্বর্গবাস হয়[৬]; এমন কি দেবতাগণের ন্যায় সুখভোগ করা যায়[৭] তথাপি এই স্বর্গ সুখও চিরস্থায়ী হইবে না; পুণ্যকর্মফলও ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয় এবং একদিন সেই সঞ্চিত সুকৃতিভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গেলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মরদেহ ধারণ করিতে হয়।[৮] অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গে মোক্ষলাভ হইবে না, একমাত্র 'ব্রহ্মসংস্থ হইলেই তাহা সম্ভব'।[৯]

(খ) কামনা এবং কর্ম যদি দুঃখ[১০] ও সংসারবন্ধনের কারণ হয়, তবে সমুদয় বাসনা ও কর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিলে সব দুঃখের অবসান তো হইবেই, মোক্ষ প্রাপ্তিও আয়ত্তে আসিবে[১১]। ইহারই নাম নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাস।

৩। ক (১।২।৫); মু (১।২।৮)—'অবিদ্যায়ামন্তরে... ম্যমানাঃ'।

৪। মু (১।২।১—৭)...'মন্ত্রেষু কর্মাণি....পুনরেবাপিযন্তি'।

৫। মু (১।১।৪-৫)— 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে— তদক্ষরমধিগম্যতে।

৬। মু (১।২।১০)—'ইষ্টাপূর্তং.....নাকস্য পৃষ্ঠে..... বিশন্তি।'

ছা (৮।১।৬)—'তদ্ যথেহ কর্মজিতো.....পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে.....';

ঐ (৮।২০—২১)—'ত্রৈবিদ্যা...ব্রহ্মলোকং বিশন্তি...'।

৭। ক (১।১।১২-১৮)—'স্বর্গে লোকে.....মোদতে স্বর্গলোকে'।

৮। ছা (২।২৩।১)—'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা.....ব্রহ্মসংস্থো-ঽমৃতত্বমেতি।'

ঐ (২।৪২-৪৪)—'যাবিমাং পৃথিবীং বাচঃ..... সম্রাড়েবৈ ন বিরাজতে।'

৯। ঐ (৫।২২)—'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এবতে'.....।

প্রকৃতির বিধানে আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয় বহির্মুখী[১০] এবং এজন্যই আমরা স্বীয় হৃদয়ে অবস্থিত অনন্ত আনন্দের উৎস পরমাত্মাকে দেখিতে পাই না,[১১] এবং অনিত্যসুখের বিষয়বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিয়া মরি। অতএব এই শাশ্বত দুঃখসমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহাদের সমস্ত কামনা ও ভোগ্য বিষয়বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করা[১২]। যে পথে গেলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহাকেই নিবৃত্তি মার্গ বলে।

কিন্তু, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, দেহধারীকে ন্যূনতম হইলেও কিছু পরিমাণ ইন্দ্রিয় চালিত কর্ম করিতেই হইবে, যথা আহার মল-মূত্র ত্যাগ। যদি ইহার প্রত্যেকটিই পরিণামে দুঃখ বা বন্ধনের কারণ হয় (কারণ, প্রত্যেক কর্মের কিছু না কিছু ফল হইবেই), তবে তাহা নিবারণের উপায় কি?

নিবৃত্তিমার্গ, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি উপায় বিধান করিয়াছেন :

(১) ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগের উপকরণ মনে না করিয়া, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম কিন্তু পরিমিত ব্যবহার করিতে হইবে[১২]।

(২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ চিরস্থায়ী নহে, তাহাতে শাশ্বত দুঃখের নিরসন হইবে না,[১৩] এই জ্ঞান জন্মিলে ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষুধা কমিবে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বা কর্মের প্রতি আসক্তিও লুপ্ত হইবে।

যাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে, তিনি আর বাহ্যবস্তু হইতে সুখ আহরণ করিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ তিনি নিজ অন্তঃকরণ হইতেই অসীম আনন্দ লাভ করিয়া আত্মারাম[১৪] বা ভূমানন্দ হইয়াছেন।

৩) যেটুকু কর্ম করিতেই হইবে, তাহা পদ্মপত্রে নীরের ন্যায়[১৫] অনাসক্ত থাকিয়া, এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ[১৬] করিয়া সম্পন্ন করিবেন। কারণ, যে কর্ম কামনা চালিত হইয়া করিলে 'প্রবৃত্ত' কর্ম হয়, সেই কর্মই জ্ঞান পূর্বক নিষ্কাম হইয়া করিলে 'নিবৃত্ত' কর্ম হইয়া মুক্তিলাভের সহায়ক হয়।[১৭] সুতরাং নিবৃত্তি মার্গের উদ্দেশ্য নৈষ্কর্ম (বা কর্মহীনতা—যাহা অসম্ভব) নহে,—নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন,—ইহাকেই গীতায় প্রকৃত সন্ন্যাস বলা হইয়াছে।[১৮]

(৪) কামনাহীন হইবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটেও কিছু প্রার্থনা করিবেন না[১৯]। পুত্র বিত্ত, লোক সকল কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন[২০]।

(ক্রমশঃ)

১০। ক (২।১।১)—'পরাঞ্চি খানি····অমৃতত্বমিচ্ছন্' গী (২।৫৮) যথা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ·····।

১১। ক (১।৩।১১-১২)—'মহতঃ··সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।'

১২। গী (৪।২১)—'নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা···শারীরং কেবলং কর্ম···'।

(৬।১৬-১৭)—'নাত্যশ্নতস্তু·····যুক্তাহারবিহারস্য·····যুক্তস্বপ্নাববোধস্য···দুঃখহা।'

১৩। ছা (৭।২৩।১)—'···নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।'

১৪। গী (৫।২১-২৪)—'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা····· যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম·····'।

১৫। ছা—'যথা পুষ্করপলাশ আপো···কর্ম ন লিপ্যতে।' এই মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি আমরা পাই গীতার ৫।১০ শ্লোকে—'··লিপ্যতে···পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।' ইহা 'কর্মযোগ' প্রসঙ্গে বিস্তারিত হইবে।

১৬। গী (৫।৮-৯)—'নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি···· ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু···ধারয়ন্।'

১৭। ম (১২।৮৯-৯০)—'ইহ চামুত্র···কৃতাকৃত্যেতি পঞ্চ বৈ।'

১৮। গী (৫।২-৩)—'সংন্যাসঃ··· জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী····প্রমুচ্যতে'; (১৮।৭-১১)—'নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ···স ত্যাগীত্যভিধীয়তে'।

১৯। ক (২।১।২)—'···অথ ধীরা····ন প্রার্থয়ন্তে'।

২০। বৃ (৪।৪।২২)—'এতমেব প্রব্রাজিনো····· প্রব্রজন্তি·····।'

সাহিত্যে রূপকথা

শ্রীমতী তরঙ্গী মল্লিক

সাহিত্যের দরবারে রূপকথার স্থান কোথায় এবং উপযোগিতা কি? এই নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে বহুবার। বাংলা সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রে রাক্ষস খোক্কসের গল্প এবং দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার কথা পড়তে গিয়ে মনে হয় বুঝি এক অযাচিতভাবে অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মনে হয় এ এক অপ্রয়োজনীয়ের আনন্দে সৃষ্ট অদ্ভুত অস্বাভাবিক কথাসাহিত্য। যার কোনও মূল্য নেই সাহিত্যের মহান দাবিত সভায়।

কিন্তু আমাদের এই ধারনা যে কতোবড়ো ভুল এবং নিছক অর্থহীন অবিচারে ভরা সেকথা একটু চিন্তা করতে গেলেই ধরা পড়ে। শিশুর Growing mind এর সঙ্গে এক অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই 'রূপকথা' নামক অমূল্য সাহিত্যসৃষ্টি। শিশুমন যখন ফুটে উঠছে তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে, আশ্চর্য হচ্ছে প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে, আকাশে মেঘের খেলা দেখে গড়ে চলেছে এক অচিনপুরীর প্রাসাদ, পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন তাকে দিচ্ছে দোলা, তখন রূপকথা তার সেই কল্পনার জাল বিস্তারে করে এক অরূপণ সাহায্য। সে অবাক হয়ে দেখে কে এক অজানা বন্ধু লেখক তার কল্পনাকে করেছেন বাস্তবে রূপায়িত। সে পড়ে আর আশ্চর্য হয়, আনন্দিত হয়। তাই মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে সে বসে থাকে রূপকথার রাজত্বে। রাজপুত্র যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধারে যায় তার মনও উড়ে চলে কোন এক নিরুদ্দেশের পানে। অসীম কৌতূহলে অবাক আগ্রহে সে বৈধ্য ধরে থাকে পরের ঘটনা জানার জন্য। রূপোর কাঠি সোনার কাঠির স্পর্শে যখন রাজকন্যার ঘুম ভাঙে তখন সেও ফেলে মুক্তির নিঃশ্বাস। শিশু অনুভব করে বন্দিত্বের যন্ত্রণা ও মুক্তির আনন্দ।

এদিকে রূপকথার গল্প এগিয়ে চলে—কোথাও বাঁদর হয় রাজপুত্র কোথাও বা ফুল হয়ে ফুটে থাকে রাজপুত্র রাজকন্যারা। দুয়োরাণী, দুয়োরাণীর গল্প পড়তে গিয়ে দুয়োরাণীর দুঃখে সে কাঁদে, দুয়োরাণীর নির্যাতনে ব্যথা পায়। এইসকল নানারকম মিশ্রিত অনুভূতি তার মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

রূপকথার সহজ সরল ভাষা এবং বর্ণনা শিশুকে সহজেই আকৃষ্ট করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয় পড়ার আগ্রহ, অভ্যাস এবং মনঃসংনিবেশের শক্তি। অনেক সময় গল্প বলার মাধ্যমে রূপকথার অনেক উপদেশেরও সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়—লোভের শাস্তি, নিরপরাধের পুরস্কার ও অন্যায়ের নিদারুণ পরিণতি। এইভাবে রূপকথা শিশুর চরিত্র গঠনেও সাহায্য করে।

সুতরাং শিশুসাহিত্য হিসাবে রূপকথা একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। শিশুমনে এর অত্যাশ্চর্য প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে দেশে দেশে কালে কালে। সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রূপকথার কথা ও কাহিনী প্রচলিত ছিল প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই। ভারতবর্ষেই সভ্যতার গোড়াপত্তন। সুতরাং বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে এই রূপকথার শুরু। ক্রমে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে অন্যতম মিশরীয় সভ্যতায় এর উন্মেষ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপিতে ও পর্বতগাত্রে। পাশ্চাত্যের ফ্রান্স, স্পেন, স্কটল্যান্ড, গ্রীস প্রভৃতি দেশে এখনও নানারূপ রূপকথার প্রচলন আছে। সুদূর প্রাচ্য অর্থাৎ চীন ও জাপানের রূপকথা আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। ইংরাজী Aesop's fable ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণেই লিখিত উপদেশ সম্বলিত রূপকথার গল্প।

সুতরাং সর্বদেশে সর্বকালে রূপকথা রচিত হওয়ার একমাত্র এবং অন্যতম কারণ এই বলা যায় যে, চিরন্তন শিশুমনের স্বাভাবিক, সরল রঙিন কল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক অপূর্ব অভূতপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি। রূপকথার সাহিত্য মূল্য, যেমন কোনও বিচারের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা অসম্ভব তেমনই অবান্তর বলে মনে হয়। 'এ' যেন সাহিত্যের বিশাল দরবারে প্রবেশের অথবা উপনীত হবার চাবিকাঠি স্বরূপ।

নীলমাধবের টানে

যোগমায়াপুরী

আমরা চলেছি পুরীর মন্দিরে মন্দিরে। আকাশ ছুঁয়ে দেব দেউলে জয় পতাকা উড়ছে। সকলে পূর্ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বিরাট বিরাট পাথরের সোপানগুলি পার হয়ে বিস্তৃত আঙিনা পারিয়ে জগন্নাথকে চাঁপাফুলের মালা পরিয়ে সেদিন পূজা করলাম, বিমলা মন্দিরেও দিলাম একছড়া লাল পদ্মের মালা। বড় ভুজ মন্দিরে গিয়ে দেখি গৌরাঙ্গদেব সেদিন সেজেছেন রাধারাণী সাজে গ্রাম্য মেয়েদের মত হলদে সুতীর শাড়ী পড়ে বেণী ঝুলিয়ে কলসী কাঁখে করে যেন জল আনতে যাচ্ছেন। ভারী ভালো লাগলো এ যেন বেশ বিনোদিনী রাধা। নীল সবুজ হলদে রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ দেবের তিনটী রঙ দিয়ে বড়ভুজ বিগ্রহটী। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে জগন্নাথ ক্ষেত্রধামে একটী বটবৃক্ষে প্রণাম করলাম, ডালে ডালে রঙীণ কাঁপড় বাঁধা। যে যা মানসিক করে সেই প্রার্থনা সফল হয়। সূর্য দেবতা তখন মধ্য গগনে, আমরা ফিরে এলাম এবার আপন আলয়ে।

এদিকে রোজকার মত ঘোষ মহারাজের নাতি বায়না ধরে সমুদ্রে চান করবে। মায়ের শাসন শুনবেনা। এক একদিন এসে চুপি চুপি নালিশ করবে মায়ের কাছে এসে ঐ দেখ মা সতীমাকে বলে দাও মন্টু মামু সেই তখন থেকে চান করছে। ওকে বকে আসবে, আবার বায়না ধরে আমাকেও নিয়ে চল চান করবো। তার ঝোঁক করা দেখে চিনু নিয়ে গেল তাকে টানতে টানতে সমুদ্রের দিকে তার সঙ্গে চিত্রাও চান করলো, অরুণদা এদিক থেকে সাবধান করে রোজ রোজ ঐ রকম সমুদ্রে সাঁতার কাটা দেখে, একদিন বলেন গতবার এই পুরীতে আমরা যখন এসেছিলাম, সবাই সেদিন সমুদ্রে তীরে গেছে ঠাকুর আমাকে ভোর থেকেই সাবধান করে দিয়ে ছিলেন আজ একটু জল করবি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনি সুহাস সুধনদার ও সকলের মুখে, অথল সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলো আর একটু হলে একেবারে গভীর জলের দিকে তলিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে ডুলিয়ারা টিউব বেলট দিয়ে সাঁতার কেটে নিয়ে এল। ঠাকুরের খুব কৃপা ঐ কারেন্ট থেকে চলে আসতে পেরেছে সাঁতার কেটে। সীতাদি আমি বলি হাঁ সেবার আমরাও সমুদ্র তীরে ঠাকুরের মূর্তি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সমুদ্রের ঢেউ এসে আমাদেরও ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল এই বলে সকলে খুব হাঁসতে লাগলাম।

সেদিন ভিন্ন সকালে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখি শ্যামরূপের ছায়া সমুদ্রের জলে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় সকলে একে একে স্নান পূজা সেরে নিয়ে মন্দির পথে রওনা হই। বেলা দ্বিপ্রহর হতে চলে আসি সেখান থেকে নিজেদের আলয়ে এসে শুনি মন্টু আর কোলকাতা যাবে বিকেলের ট্রেনে তারই চলে প্রস্তুতি। সকলে আমরা আহারাদি সেরে নি, ঘোষ মহারাজ বলেন একসঙ্গে যখন এসেছি এক সঙ্গে ফেরা যাবে তাঁর ছোট্ট নাতি ও ছাড়েনা বলে মন্টু মামু আমাকে সমুদ্রে চান করাবে, মন্টু বলে ভুল খুলে গেছে অমলদারাও বোধ হয় এতদিন তীর্থ থেকে ফিরে এসেছে আমাকেও কোলকাতা যেতে হবে!

এমন সময় মন্দির থেকে পাণ্ডাজী এসে হাজির জগন্নাথের নির্মাল্য নিয়ে। সতীমা ও আমরা কোলকাতা আশ্রমের জন্য প্রসাদ পুষ্প ঠিক করে দিলাম। কাশীপুর বাটীতে বিশেষ ভাবে কটিকদার পূজা দেওয়া হয়েছিল সেগুলিও গুছিয়ে দেওয়া হোল। মধ্যাহ্ন প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলে এদিকে আকাশেও দেখা গেল মেঘের ছায়া, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে সুরু করলো। আবার সেই পথ দিয়ে একটি শবদেহও নিয়ে পেড়িয়ে গেল। ঘোষ মহারাজ আনন্দদা, অরুণদা আপত্তি জানান আজ কোন মতেই যাওয়া হবেনা, শেষে ঘোষ মহারাজ এগিয়ে এসে বলেন তবে জয় পত্র হোক। মন্টু বলে না না কিছু ভয় নেই তখন পাণ্ডাজী

এগিয়ে এসে জগন্নাথের পট্ট তোর গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলেন আপনি নিশ্চিন্ত মনে আমুন রক্ষা কবচ পরিয়ে দিলাম তার কথা শুনে সকলে হেসে ওঠে। মন্টু সকলকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠলো, আমাদের ঠাকুর জয় দিয়ে। গাড়ীও ছাড়লো, এদিকে তখন সমুদ্রে আকাশেও নেমে গেছে বাদল ধারা।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেছে ঝকঝকে হয়ে উঠে চাঁদ আর উজ্জ্বল তারা, কল্যাণ চাঁদের মত যেন মিষ্টি হাসে। মন্দিরে জ্বালিয়ে দি প্রদীপ ধূপ। পূরবী সুরে গেয়ে যাই সকলে সারঙ্গ দিবে মিনতী নাম। এদিকে ডাক আসে, জগন্নাথ মন্দিরে যাবার জন্তে সকলে ব্যস্ত হয়ে প্রস্তুত হয়েনি। কিন্তু বাইরে বেড়িয়ে দেখা গেল আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টিও সুরু হোল, জগন্নাথ মন্দিরের যাবার পথ রুদ্ধ দেখে সকলেই বসে পড়ি বিষন্ন হয়ে, কেউ মন্দিরে কেউ ঘরে কেউ বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে পড়ি বৃষ্টি ভেজা সমুদ্রের দিকে। কেটে যায় একটা নিশ্চুপ বাদল বেলা। জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হোল না বলে অভিমান ও আসে আজকের এই ব্যবধান যেন আরও বেদনায় ভরে তোলে, মনে হয় জগন্নাথের কাছে বসে শোনাই আরও গান দুচোখ ভরে চেয়ে থাকি তোমার ঐ রূপে।

আঁধারের মাঝে বাজে একটী সুরের গান
সঘনে ডাকে দেয়া
গাহে গো বন কেকা
নিভৃত দুখ কোণে
হে সখা আমি একা।...

দুচোখ ভরে জল আসে গাইতে গাইতে। আবার গেয়ে যাই, গান করি দেবতার আবাহনী

প্রদীপ যায় নিভে
হে প্রভু প্রিয়তম
আঁধারে এস যদি
নীরব নিরুপম
দুখের দীপ জ্বালি
চুমিব পদরেখা।

(শ্রীঅর্চনাপুরী রচিত)

কিছুক্ষণ মধ্যে আমরা চমকে যাই সহসা তুলসী আর কর্পূরের সুগন্ধ পেয়ে, জগন্নাথের কৃপার বলকে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো, তবে তিনি এসেছেন আমাদের কাছে, মনে পড়ে যায় সেবায়েত পুরীধামে জগন্নাথের কৃপার কথা, একদিন আমরা মন্দিরে যেতে পারিনি ধ্যানের আঁধারে সকলে বসে ধ্যান করছি এমন সময় সমস্ত আবহাটী সুজির পায়সের সুগন্ধে ভরে উঠলো রুবীদি আমি গীতাদি চমকে উঠি। সেদিনই দেখা গেল রাত্রে জগন্নাথের পায়স ভোগ হয়েছে পাণ্ডাজী নিয়ে এসেছেন প্রসাদ। সুধনাদি অর্চনাদি একদিন ঠাকুরকে সুজির পায়েস ভোগ দিতে বললেন, রুবীদি আমি করেও দিলাম রামপ্রসাদ রূপেনকা সুহাসদা এঁরা প্রসাদ পেয়ে বলেন ঠিক জগন্নাথের পায়েসের মত। ঠাকুরের কৃপার কথাগুলি আমরাও কোলকাতা আশ্রমে অমলদা মাসিক আঠাদের জানাতাম। যেন মনে হোত ঠাকুর আমাদের মাঝেই আছেন। কথায় কথায় বেশ রাত্রি হয়ে যায় সমুদ্রে বর্ষার ছবি দেখে এসে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

ভোর থেকেই দেখা গেল আকাশে আলোর রেখা কিন্তু আবার বৃষ্টি নামলো। সকলেই ভাবি তবে আজও কি জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হবেনা। বেলা বেলা দিন দেখে তাড়াতাড়ি স্নান পূজা সেরে নিয়ে আমি শ্রীক্ষেত্র ধামে সংকল্প নিয়ে লক্ষ জপে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল রোদ উঠেছে, অরুণদা ঘোষ মহারাজ বল্লেন তবে আজ আমরা টোটা গোপীনাথ দর্শন করে আসি, সতীমা গীতাদি আমি বললাম গোপীনাথ আমরা দর্শন করে এসেছি বরং যারা যায়নি দেখে আসুক, শোভামা শচীমা চিত্তু আনন্দদা অরুণদার সঙ্গে বেড়িয়ে পড়লেন।

সারাদিন পর আমার জপ সমাপন হোল, এদিকে এরাও ফিরে এসেছেন গোপীনাথ দর্শন করে সতীমা গীতাদি আমাদের ভালো করে দুধ দিয়ে চা খাওয়ালো, সকলে একসঙ্গে তখন ঘোট বেঁধে শুনতে বসেছি গোপীনাথ দর্শনের কথা। ঘন বনের ছায়া পারিয়ে শীতল স্নিগ্ধ তরুর নীচে একটী সুন্দর মন্দির ঠাকুরটী কুচকুচে কালো বরণ হলেও মুখটী ভারী মিষ্টি একটী বাঁশী হাতে করে বিভঙ্গ মন্দিরে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন কার প্রতীক্ষায়। পাণ্ডাজী বস্ত্রের আবরণটী

সরিয়ে দেখালেন অনেকে বলেন সোনার বরণ গৌরাঙ্গের এইখানেই প্রাণটী এসে মিশে যায়। শুনতে শুনতে আমাদের চোখে জল এল, আমরা বললাম হ্যাঁ সেবারে আমরা গিয়েছিলাম মনে হচ্ছিল না যে আমরা ফিরে আসি ওইখানেই রয়ে যাই।

এদিকে আকাশে চাঁদের আলো দেখতে পেয়ে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে রওনা হোলাম, ভিজে ভিজে পথ পেরিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে এসে হাজির, সেদিন যেন শত যাত্রীদের মাঝ দিয়ে আমাদের পথ উন্মুক্ত হয়ে আছে, সিক্ত সোপান-গুলি পার হয়ে চাঁপা বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে ছুটে এসেছি প্রভুর বেউলে কাছে দাঁড়াতেই অনুভব হোল জগন্নাথ যেন আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, তাঁর করুণায় আমাদের বুঝি কাছে টেনে নিল। আমরা ফুলের মালা পরিয়ে আনন্দে ফিরে এলাম নিজেদের স্থানে, রাত্রে তখন পূর্ণ চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের অওলান্তে।

সীমা আর অসীমা

স্বামী বীরানন্দ

আমার ছোট্ট ঘরে বসে বাতায়ন পথে
দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়েছিলাম দূরে
ঐ উধাও নীল নিঃসীমে—
ব্যাকুল প্রাণে দুহাত বাড়িয়ে যতই
ধরতে চেয়েছিলাম ঐ আকাশটাকে
ততই সে সরে গিয়েছে দূরে অনেক দূরে।
না-পারা না-পাওয়ার ব্যথা
বাড়িয়েছে শুধু অতৃপ্ত তৃষা বুক জুড়ে।
শুধু সতৃষ্ণ নয়নে তার পানে চেয়ে
বসেছিলাম তার উদার পরশ একটু
পাওয়ার ব্যাকুলতায়।
মনে প্রশ্ন ওঠে গুমরে—
কেন? কেন এমন হয়?
মনে হয় সে আমাদের ডাকে—
পেতে চাই তাকে বুকের মাঝে
হাতের মুঠোয়।
তবু, তবু কেন তাকে হয় না পাওয়া।

বুকের কোণে বেড়েই চলে
অসীমকে না-পাওয়ার কান্না
হঠাৎ দেখি—আমার "আমি" উঁকি দেয়
কান্না ধোয়া বুকের আঙিনায়
ব্যঙ্গ হাসি হেসে।
বুঝেছি—আমার "আমিই" ভুলেছে
হিমাদ্রি প্রাচীর
অসীমের সাথে মিলনের পথে।
ভেঙে দাও "আমি"র হিমালয় বাধা
শূন্য করে নিঃশেষে মেলে দাও
বিলিয়ে দাও নিজেকে সবখানে সবার মাঝে—
দেখবে তখন, তোমার ঐ ছোট্ট ঘরেই
তোমার ছোট্ট বুকে আকাশ উদার বিস্তৃতি।
তোমার বুকের অনন্ত প্রসারে
জাগবে তখন সত্যানন্দ আলোর আকাশ
অসীম অপার।

কল্পনা

শ্রীশরণাপুরী

যাগো আমার সে লাজিয়ে
সে না গো যায় ভুলে
দেখ না চেয়ে শ্যামল বঁধু
দাঁড়িয়ে পথের ধূলে।
মা গো আমার সে ছেড়েছে
সে না আশিষ মাথে
ডাকছে আমায় শ্যামল বঁধু
যাব তাহার সাথে।
মা গো আমার সে শিখিয়ে
একটি মধুর গান
ক্লান্ত যখন শ্যামল বঁধু
তোলাব তার প্রাণ।
মা গো আমার সে আঁচলে
একটি রাখী গাঁথি
চাইলে দেবো শ্যামল বঁধু—
রখিন হাতে বাঁধি।

বিরহী

স্বামী মৃগানন্দ

হে না পুছো মাঁয়ার কাহলা হুঁ
মাঁয়ার সত্যানন্দ কা প্যালা হুঁ।

চৈতী হওয়াতা কোঁকা আয়া
সুখে পত্তে উড় বরায়া
নই কলিকী আশামে ফির
হরিয়ালী কা রঙ রচায়া
পর মুঝে ন মিলা ওরোসা কুঁ।

আও বাদল পকড়ো হাথ
রাহী মাঁয়ার তুম রহনা সাথ
আঁসু ছিপাউ সিসকী রোকুঁ
সাঁনেকী অগন জলে দিনরাত
হায় ন পুছো এ্যায়সা কুঁ।

তোকে ভালবাসি বলে

সুবেন্দু মল্লিক

তোকে ভালোবাসি বলে কারো কাছে নত হতে পারবোনা
তোকে ভালোবাসি বলে কারো কাছে দাঁড়াতে পারবোনা
স্পর্শায়
তোকে ভালোবাসি বলে কাউকে বলতে পারবো না—কেন,
তোকে ভালবাসি বলে কাউকে করবোনা ত্যাগ বা গ্রহণ।

দুবাহুর অনন্ত মালায়
আমি এখনি বন্দী অথবা মুক্ত হয়ে আছি,
যেমন মাঠের মাঝখানে স্বাধীন সরোবর, যেমন
সরোবরের বাইরে প্রসন্ন প্রান্তর। নীলাভ আকাশ
দুলে ওঠে তীব্র বিরহ মিলন চিহ্নিত পবনে।
বৃষ্টি ভেজা অরণ্য পথ আজ কতো স্পষ্ট স্বচ্ছন্দে চলে গেছে
তুষার কিরীট পর্বতের দিকে।

শ্রবণ-মঙ্গলম্

সাধনাপুরী

৩রা জুন, ১৯৬০

করুণাময় শ্রীঠাকুর প্রতিদিনের মত পশ্চিমের বারান্দায় সাধু ও গৃহীভক্ত বেষ্টিত হয়ে আছেন বসে। অবশ্য ঘোষ উপলক্ষে এসেছেন যে সাধুগণ তাঁরাও আছেন আর এই আশ্রম বাসী সাধুগণও অনেকেই আছেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে আছেন জয়, সত্যেন বাবু ও দ্বিজেন সেনগুপ্তের দাদা মণিবাবু প্রমুখ কয়েকজন। সিউড়ির শিক্ষক রাইমোহন বাবুও আছেন।

শ্রীঠাকুর—জপের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। এক আছে নিস্তরঙ্গ মনে শুধু নিরন্তর জপ করে যাচ্ছে তখন আর ধ্যান হচ্ছেনা শুধুই জপ, আর হচ্ছে ইষ্ট চরণ চিন্তা করে জপ করে যাওয়া, এসব গুলো শাস্ত্রে বা সাধক জীবনীতে পাওয়া যায়। আর আমার কতকগুলো জপের পদ্ধতি মনে হয় যেগুলি আমি করেছি। মনটাকে এই জগৎ transcend করে রামকৃষ্ণ লোকে তুলে দিয়ে জপ করে যাওয়া আবার কখনও শরীরের প্রতিটি cell জপ করছে বোধ, আঙুল, চোখ, হাত, পা, প্রতিটি শিরা-উপশিরা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ শরীরের প্রত্যেকটি cell অর্থাৎ কোষ জপ করছে এ জপের তীব্র অনুভূতি এ আমি করেছি,

রাইমোহনবাবু—এটি কি করে সম্ভব? জপ তো মনের মধ্যে শুধু একসঙ্গে একটি পদ্ধতিতেই হয়?

শ্রীঠাকুর—এ দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ গভীর চিন্তার মাধ্যমে করতে হয় ইষ্ট-মন্ত্র অসংখ্য রূপে শরীরের প্রতিটি cell এর মধ্যে জপ হচ্ছে এই চিন্তা তীব্র ভাবে করতে করতে অবশ্য নামের এক গভীর অনুভূতি হয়—

বীরেনকাকা, মানিকদ্যাঠা, প্রেসিডেন্ট মহারাজ মহাসদ্য বিমলদা প্রমুখকে উদ্দেশ করে—

শ্রীঠাকুর—মনে আছে এই পদ্ধতিতে তোমাদের অনেককেই এসব করে দেখিয়েছি—

সকলে—হ্যাঁ ঠাকুর, ঠাকুর তো করেছেন আমাদের আমাদেরও করিয়েছেন, ঠাকুরের কৃপায় আমাদের ও কিছু কিছু ওই অনুভূতি হয়েছে।

শ্রীঠাকুর—তারপর আমি যেখানে বসে আছি তার প্রতিটি অণু পরমাণু জপ করছে—এসব আমি অনেককে পরীক্ষা করে দেখিয়েছি মনে আছে সত্যেন? (সত্যেন বাবুর প্রতি)—

সত্যেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর, আপনি এটি আমাকে দেখিয়েছিলেন—সিউড়ী আশ্রমে একদিন এই প্রসঙ্গ হয়েছিল তাতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম সে কি করে সম্ভব। তাতে আপনি বলেছিলেন, 'কেন সম্ভব নয়—সবই তো চৈতন্যময়। তবে প্রকাশ ভঙ্গী তারতম্য আছে।' আর বলেছিলেন 'আমি জপ করে যাচ্ছি তুমি মন্দিরের বারান্দার থাম, দরজা, দেওয়াল, মেঝে স্পর্শ করে দেখ।' ঠাকুর আমি কিন্তু সন্দিগ্ধ মন নিয়েই পরীক্ষা করেছিলাম তা আপনার কৃপায় আমার উপলব্ধি হয়েছিল ঠাকুর, সত্যিই সব জপময় হয়ে রয়েছে, জপের গভীর vibration এ থাম ইত্যাদি সবই vibrate করছে, আপনার জপের vibration এত তীব্র, এত গভীর।

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ মনে পরেছে।

সাধুদের অনেকেই—ঠাকুর, এতো আপনার কৃপায় কয়েক বারই অনুভব করেছি।

শ্রীঠাকুর—এই Process এ জপ আমি করতাম তার কারণ আছে—সব সময় তো মনকে খুব একাগ্র-একমুখী করে ধরে রাখা যায় না—অথচ জলবৎ নামে স্থিতি প্রয়োজন—এজন্য একঘেয়েমি যাতে না আসে আর জপের Personality intensity, force এসব যাতে গড়ে ওঠে, মন আনন্দ পায় তার জন্য নতুন নতুন Process এ জপ করলে খুব কাজ হয়। আর এই রকম জপসিদ্ধ মহাপুরুষ

বা সাধকের কাছে গেলেই সাধারণ মানুষও ভগবৎ মুখী হয়ে যায়।

সাধুদের অনেকেই—ঠাকুর, আপনার কাছে এলেই আমাদের বেশ জপ হয়—অন্য সময় জায়গার চেয়েও আপনার কাছে বেশী জপ হয়।

এরপর শ্রীঠাকুর নদীয়াকে ভারতের সাধক পাঠ করে শোনাতে বললেন—সে বেশ ভাল পাঠ করে সেজন্য। বেশ কিছুক্ষণ ভারতের সাধক পাঠ হওয়ার পর বললেন—

শ্রীঠাকুর—তোমাদের কারোকে কারোকে রোদে বসে জপ করতে বলেছিলাম—

তারানন্দ—হ্যাঁ ঠাকুর বলেছিলাম।

অমল—হ্যাঁ ঠাকুর বলেছি—

গদাই, শ্যামল, পূর্ণ—হ্যাঁ ঠাকুর বলেছি।

শ্রীঠাকুর—দেখ মনের যেদিকে গতি তোমার জীবনের গতিও সেই দিকেই যাবে। যদি রসগোল্লার বাসনা মনে থাকে তার তখন ঠিক বাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে হবে—আর যেতে যেতেই ঢুকে পড়লে আর রসগোল্লা খেতে সুরু করলে। যাদের মাংসের কথা মনে পড়ে ক্ষুধাগত মনে হতে হতে তারা মাংসের দোকানে বা হোটেলের দিকে দৌড়বে। (তারানন্দের প্রতি) মাঝে মাঝে এগুলো বিচার করবিরে—সাধু হওয়া অত সহজ নয়। আহার, নিদ্রা বিলাসিতা, সংসার বন্ধন এসব বহুযুগ ধরে অভ্যাস করে করে এমন করে সংস্কার গড়ে ওঠে যে এর বাইরে মন উচ্চচিন্তা নিয়ে থাকতে পারে না—বেশীর ভাগ মানুষের মন হাসিয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবৎ লাভ করতে গেলে, সন্ন্যাসী হতে গেলে, তপস্যা করে করে, প্রার্থনা করে করে, শুভ সংস্কার ত্যাগমুখী সংস্কার গড়ে তুলতে হবে।

চারে চিনি খাওয়া, মিষ্টি সন্দেশ এসব খাওয়া সাধু জীবনে কতখানি উচিৎ সে সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বললেন—

শ্রীঠাকুর—দেখ চারে একটু চিনি খেলে এমন কিছু আসে যায় না—তবে ব্রহ্মচর্য গ্রহণের পর প্রথম দিকে কয়েকবছর বেশ কঠোরতা করতে হয়—যাতে ভোগ মুখী মনটা switch off হয়ে যায়—আর আমার নিজের ক্ষেত্রে দেখ কোন মিষ্টিও খাইনা—চা ও খাইনা চারে চিনি খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না মনে। সন্দেশ রসগোল্লা অবশ্য বেশীরভাগ সাধুদের ক্ষেত্রে খাওয়া উচিৎ নয়—তবে বয়স্ক সন্ন্যাসী বা দুর্বল শরীর যাদের তারা দুএকটা মিষ্টি খেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে সাধুদের সুস্বাদু বা খুব মুখরোচক আহার মিষ্টি ইত্যাদি বা খুব energetic আহার শরীরে দেওয়া উচিৎ নয়—বেশী energy সৃষ্টিকারী আহারে সাধুদের ক্ষতি হয়—তাদের তো বেশী energyর দরকার নাই—সাধুর শরীরে বেশী energy হলে মন নীচের দিকে নামতে সুরু করবে। সাধুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা। সাধুর বেশী মসলা দেওয়া আহারও ঠিক নয়—দুধও বেশী খাওয়া ঠিক নয় অবশ্য গ্যাসট্রিকের রোগীদের কথা আলাদা। আর মাছ মাংস তো কথাই নাই ওতে extra energy grow করবে আর মনের চাঞ্চল্য এনে দেবে।

তাছাড়া দেখ সুস্বাদু আহার দামী, আহার এসবের অভ্যাস যদি ছাড়তে না পারা যায় তাহলে তার জন্য অর্থের প্রয়োজন আর চেষ্টারও প্রয়োজন। তাহলে কতটুকু সময় তুমি ধর্মচিন্তা, ভগবৎ চিন্তা করবে ভগবৎ নির্ভরতাই বা আসবে কি করে? মনও উপদ্রবহীন, বিষয় চিন্তাহীন হতে পারবে না। সেজন্য উচ্চচিন্তা বা ভগবৎ চিন্তা করতে গেলেই plain living প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন তপস্যা করে যেগুলো বুঝেছি বললাম তোমরা যতটা পারবে নেবার চেষ্টা করবে।

ইত্যাদি কথার পর গীতা, কথামৃত পাঠ ও নামান্তে শ্রীঠাকুর উঠলেন।

৪ঠা জুন, ১৯৬০ (দ্বিপ্রহর)

আজ কয়েকদিন হল অখণ্ড হোম সুরু হয়েছে সকাল সাড়ে আটটা থেকে (আমাদের ও বাইরের) ও সন্ধ্যা সাড়ে আটটা থেকে ত্যাগী সন্তানদের হোমের পালা। তাই আমাদের হোমের সময় নামও পাঠে যোগ দেবার জন্য ভক্তবাড়ীর মায়েরা ও মেয়েরা প্রায় রোজই আসছেন। শ্রীঠাকুর তার মন্ত্র শিষ্য ও শিষ্যাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ধর্মানুষ্ঠান খুব ভালবাসেন সেজন্য শ্রীঠাকুরের ইচ্ছাতেই তাঁরা বেলা নয়টা নাগাদ ছুটে আসেন। স্থানীয় বা কাছের

ভক্ত মায়েরা ও মেয়েরা তাঁরা দুপুরে গৃহকর্ম সেরে হেসে আসেন। আজ অন্যান্য ভক্ত মায়েদের সঙ্গে অমিয় বাবুর সহধর্মিনী ও মেয়েরা এসেছেন শ্রীঠাকুর তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলছেন—

শ্রীঠাকুর—সব কুশল তো মা?

বিভাময়ী—আজ্ঞে হাঁ ঠাকুর আপনার কৃপায় ভাল। ঠাকুর আপনি আশীর্বাদ করুন যেন মেয়েদের পড়াশোনা ভাল হয়—পরীক্ষার ফল ভাল হয়।—

শ্রীঠাকুর—হাঁ মা ঠাকুরকে ডাক আর মেয়েরা তো বুদ্ধিমতীও বটে আর চেষ্টাও আছে।

অমিও বাবুর মেয়েরাও কয়েকজন পড়ার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানালো। অন্য ভক্তবাড়ীর মায়েরাও সন্তানদের চাকরী ও পড়া ও পরীক্ষায় পাশের প্রার্থনা জানালো।

শ্রীঠাকুর—(সকলের প্রতি) দেখ শুধু পাশের জন্য বা চাকরী ইত্যাদির জন্য ঠাকুরকে ডাকা এটি ঠিক নয়—পড়া তো পাশ করলেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মানুষ হওয়া একদিনে হয়না—যতদিন বাঁচবে ততদিনেই মানুষ তৈরী হবে—তার জন্য ঠাকুরকে ডাকতে হবে—মস্তবড় পাশ্চাত্য দার্শনিক William James বলতেন Religion is the panacea of all ills ধর্মই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তির মূল। পড়াশুনা পরীক্ষা pass এগুলো stamp মাত্র কিন্তু মানুষ হতে গেলে আছে ধর্ম, নৈতিকতা স্বাস্থ্য আছে সুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ, শোক, চরিত্রবত্তা দয়া, পরোপকার সহানুভূতি কত কি এসবের মধ্যেই মানুষ তৈরী হয়—কাজেই ধর্মই যখন সমস্ত সমস্যা সমাধান করে তখন ঠাকুরকে রোজ দু তিনবার ডাকার চেষ্টা করবে। ধর্মপথ যখন নিয়েছ, তখন ঠাকুরের প্রসন্নতা লাভের জন্য সব একটু করে বুক দিয়ে ডাকবে। তাছাড়া একমাত্র পাগল ছাড়া নিজের বাপকে কেউ অস্বীকার করেনা—ভুলে যায় না—যিনি এই সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রাণী জগৎ জীব জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন, ঋষিরা যাঁকে 'পিতানোঽসি' বলে জেনেছেন তাঁকে ডাকতে ভোলা আমাদের আদৌ উচিত নয়।

তবে অভাব অভিযোগ সব ঠাকুরের কাছে ছাড়া কার কাছে জানাবো, কিন্তু বেশী নয়, তাঁর প্রীতি লাভের প্রার্থনাই বড় কথা, তাছাড়া এজগৎটাই কিছু চরম স্থান নয়—মৃত্যু একদিন সবারই আসবে, কাজেই মৃত্যুর পরে পরলোকে যাতে শ্রীঠাকুরের কৃপা পাও তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাই নিত্য নিত্য ডেকে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন কর। তাঁর প্রীতি লাভ কর।

———

ধূলা-কাদা অঙ্গে মেখে, মলিন মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কত তাপিত পতিত সন্তান। নিঃশেষে যারা খুইয়েছে তাদের অন্তরের সমস্ত সম্পদ, সর্বহারা ভিক্ষুকের মতো অনুতাপের শূন্য ভিক্ষাপাত্রখানি হাতে নিয়ে তারা এসে দাঁড়িয়েছে নত শিরে —শুধু কৃপা, শুধু করুণার দুটি ফোঁটা অমৃত-সিঞ্চন, তাতেই ভ'রে যাবে এই সর্বগ্রাসী রিক্ততা—তারাও যায়নি ফিরে, হতাশা বুকে নিয়ে পেয়েছে অমূল্য সম্পদ, পেয়েছে আশ্বাস : "আমার ছেলেকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও, কিছু ক'রতে পারবে না।"

—"জননী সারদেশ্বরী"—শ্রীঅর্চনাপুরী

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাপ্তি !

ডাঃ মল্লীরা বসু, এম. ডি. এফ. আর. এইচ. এস. এফ. আর. এইচ-এ.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প-সমাধি-সিদ্ধ পরমপুরুষ মহা-মানব যুগাবতার যুগ-দেবতা।

তিনি ত' জানতেন সকলি। তিনি সর্বজ্ঞ। অন্তর্যামী তিনি। তিনি যা করে গেলেন, দেখেও গেলেন স্ব-চক্ষে। তার কি ফল,—তাও ছিল তার দিব্য-দর্শনে। তার ফলাফল যে কি—কতটা ও কতখানি, ছিল না কী তাঁর আঁখির আগে, ছিল কী তবে আঁখির আড়ালে।

তিনি শুদ্ধ, তিনিই কী তাঁর শেষ ?

তিনি আদি, তিনি অন্ত। না না, অন্ত তিনি নন; কখনই নয়। "তার ইতি করিসনে—" তাঁর ব্রহ্ম-বেদ-বাণী যে অ-সত্য হ'য়ে যায়। অন্ত তিনি ন'ন,—অনন্ত তিনি। তাইতো তিনি বলে গেলেন : "আমি আবার আসবো—"

কিন্তু, কেন "আসবো—" অধমের সে-প্রশ্ন নয়, সে স্পর্দ্ধাও নয় এই দীনহীনের।

জিজ্ঞাস্য শুধু মন মোর—"আসবো"ই যদি তবে এতো তাড়াতাড়ি কেন। আর, কেনই বা এই সামান্য ন্যূনতম ১৬ বছরের ব্যবধানে।

"দেবতারে প্রিয় করি,
প্রিয়েরে দেবতা।"

দেবতারে শ্রীশ্রীঠাকুর "প্রিয়" করে গেছেন— এ যে স্বতঃ-সিদ্ধ। কিন্তু "প্রিয়েরে দেবতা"— ?

হয়নি বুঝি তা।' তাই কী তাঁরই কর্ম-ভূমিতে তাঁর পুনরাগমন—,ইচ্ছাবতরণ এই ন্যূনতম সামান্য ব্যবধানে— ?

"এই মূর্তি ঘরে ঘরে পুজো হবে—" বলেছেন তিনি। তাঁর সে-কথা সত্য প্রমাণিত, সত্যই তাঁর সেই শোভন লোভন ছবি ঘরে ঘরে পুজো হয় আজও—, হবেও। কিন্তু ঘর ও ঘরণী কী তাঁর কৃপাকণা পেয়েছিল। পেয়েছিল কী তাঁর কোমল কর-পরশন। লভেছিল কী তাঁর দীক্ষা—, তাঁর সস্নেহ দেহ অনুরাগে সিক্ত দীক্ষা-ধন্য হয়েছিল তা'রা।

নিজেকে সদাই ধ্যান-গম্ভীর ভাবঘন সমাধি-মগন করে রাখতেন। লীলা-অঙ্গনে মাতৃ মধুর ঔন্নত্য আনন্দ-নিকেতনে প্রজ্ঞা-জ্ঞান-দীপ্ত বিমোহন্। আর, এদিকে ১১শ'টি আপন ভক্ত-সন্তানদের জন্য পাগল-পারা ! আর, ওদিকে তাদেরই জন্য সদা ব্যস্ত-সমস্ত কর্ম-চঞ্চল নহবতে একা শ্রীশ্রীসারদা মা—অশোকবনে বন্দী সীতা-সম ! দোসর সাথী শুধু লাটু (লাটু মহারাজ)। সেখানেও তাঁর দিব্য-দৃষ্টি জ্ঞান-ভারতী : "ওরে ও-কে গিয়ে শান্ত কর, ও যদি একবার রাগে আমার সব নস্যাৎ হ'য়ে যাবে।"

আরও ছবি: তিনি থাকেন আপন ঘরটিতে ভক্ত-জন সমাদৃত পরিবৃত। শ্রীশ্রীমা আপন ঘরে নহবতে সদাই কর্ম-ব্যস্ত। মাঝে ব্যবধান শুধু বেড়ার। সেই বেড়ার মধ্যে ছোট্টো এক ফুটো। এপারে সেই ফুটোর মধ্যে একটি তৃষিত নয়ন—ওপারে ওঘরে ওই নয়ন ভুলানো বিশ্ববিমোহনের বিশ্বরূপ-দর্শন লাগি দণ্ডায়মান। ক্রমান্বয়ে দিনে দিনে সেই ফুটো একটু একটু করে হয় বড়—'আপন বড় দুই নয়ন ভরি' ওই বরতনু দেখ-দেহ দরশন লাগি।' সেখানেও তাঁর আলোকপাত, তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিব্যজ্ঞান : "ওরে হৃদে, তোর সাধীর যে পর্দা ফাঁক হ'য়ে গেল।"

পরাণের মধ্যাহ্ন আহার থালা সাজি ভরি' নিয়ে আসেন প্রতিদিন ওঁর ঘরে সারদা।

দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে এই শুভক্ষণটুকুই পরমক্ষণ— সারদার নিজস্ব একান্ত করে আপন পাওয়া— ; একটুকু কাছে বসা, একটুকু কথা শোনা, একটুক ছোঁয়া লাগা। পরমলগন।

তারও নানা বাধা, নানান বিপত্তি। বাধার বিজড়িত শোকা-তপ্তা পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ীর গোলাপ-মা—, গদাধরের শ্রীচরণাশ্রিতা। কোথা থেকে এসে জুটে সে-ই আপ বাড়িয়ে নিয়ে চলল গদাধরের মধ্যাহ্ন-আহার। ন্যূনতম অধিকারও হারাল সারদা! সেই সেদিনের মহাব্রত-বাসিনী!

মহাব্রত—, নামটি ত' বেশ। কিন্তু সেটি এক গর্ত না গুহা, না কি; কোঠর না কুঠরী ভেবে পায় না কোটর-বাসিনী সারদা হই জীবনে। বিগত জীবনে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্র) ছিল তবু শুভটুকু কাণ্ডজ্ঞান, বন-বাসিনী তাঁরে (মনবদুঃখিনী সীতা) করেছিলেন সত্য; তবু তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) বেছেছিলেন খোলা-মেলা মনোমত মনোরম এক তপোবন। আর, এবার কী কাণ্ড কারখানা এই মহাব্রত; এখানে দিনে-রাতে মানুষ বাস করতে পারে। এ যে শ্রীহীন হতচ্ছাড়া এক ফাটক—, কয়েদ-ঘর।

তাই কী—, সত্যব্রতর শুভাগমন সর্বাধুনিক কংস-কারাগার—লালবাজার হুকে!

তাই কী—, তাঁর ধ্যান যজ্ঞশালা 'ছায়াবীথি'র ত্রিতলের ওই চোর-কুঠরী।

তং, সারদার মানস-মনে নাই কোন বিক্ষোভ, কোন দ্বন্দ্ব, চেতন-চৈতন্যে নাই কোনও বিপ্লব কোনও ধিক্কার। সারদা সর্বংসহা আনন্দমূর্তি, শক্তিরূপিণী স্বয়ংসিদ্ধা।

এমনি আরও একদিন। যথা নিয়মে এদিনও শ্রীশ্রীমা চলেছেন মধ্যাহ্ন-আহার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে। সহসা এক কন্যা আসি পথ রোধিল . দাও না মা, আমি দিয়ে আসি।

তথাস্তু। রিক্তা মা ছেড়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ন ভালি রিক্তহস্তে, সামান্য এ-অধিকারটুকুও অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিলেন সেই-মেয়ের হাতে। ঠাকুরের প্রমুখে তাঁর সে অন্ন-ভালি নামিয়ে রেখে সে-মেয়ে তখনি ছোমাপাখীসম চো চা দৌড়।

শ্রীশ্রীমা স্মিতমুখে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বীতরাগ সুর মন মেতে পারছি না আমি! জানো না তুমি—, ও কে?

অন্তর্যামী হরিজন সে-মেয়ে। শ্রীশ্রীমা'র মন্দ্রকণ্ঠ: জানি।

—জানো যদি তবে ওর হাতে দিলে কেন? ও ছোঁয়া আমি খাই কি করে!—শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুযোগ; গর্জন যদি বা নয় শ্রীশ্রীমা'কে, তর্জন তো!

—আজকের মতন যাও—। সারদার শ্রীকণ্ঠে মিনতির সুর।

—কথা দাও, আর কারও হাতে দেবে না আমার খাবার—; গদাধরের কল-কণ্ঠে কথার বজ্র-বাঁধুনী।

কথা দাও—। না, পারলেন না; প্রাণ খুলে শ্রীশ্রীমা কথা দিতে পারলেন না।

বরং বললেন ব্যঞ্জন তোজি' মুক্ত করে শ্রীকণ্ঠে তাঁর কল-কাকলি: তা আমি পারব না! আমি মা—, সবার মা; সে-ও আমার মেয়ে। কেও যদি 'মা' বলে চায় আমি বাধা দেব কেমন করে। তুমি তো কেবলি আমার ঠাকুর নয়, সবার—সকলের। তবে, বলছ যখন, আমি চেষ্টা করবো—।

ব্যস্। নটরাজ—, শান্ত শিব, প্রশান্ত হিম-শীতল। ব্রহ্ম আর শক্তির কী বিপুল খেলা,—অনন্ত লীলা।

(ক্রমশ:)

কেউ একটু কাজ করছ খাটছ বলে ভুলেও 'আমি করছি' বলে অহংকার যেন না আসে—সব Predestined, যেখানে যেটা হবার সব ঠিক হয়ে আছে। জগন্নাথের রথ চলবেই— রজ্জুতে হাত লাগিয়ে ধন্য হওয়া শুধু।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব

উদয় শঙ্খে বাজে তোমার জয়

শান্তি দেবী

জ্যোতির বলয় মাঝে, মহাছন্দময় অনন্তসুন্দর।
নবারুণ রঙে রাঙা, আনন্দ-স্বরূপ।
স্পর্শ তাঁর আনন্দ সৌরভ,
তৃপ্তি আনে মর্ত্তের মৃত্তিকা,
মধুময় এ ধরা নন্দন।
বিচিত্র রূপের মালা ধরণীর বুকে, সৃজন তুলিতে আঁকা।
অরূপের রূপ লেখা, অকূপের সাত রঙা রঙে,
সোনার আলপনা—
সাজানো ভুবন।
তারপর—, তারপর—নিলাঞ্জন চোখে
বিবর্ণ আকুল চিতে দিয়ে যায় ডাক্
তিমির রাতের ছায়া যুগ যুগ ধরে।
সে যে চিরন্তন, ক্ষণিক সে নয়
ক্ষণিকের ছায়া জীবন মরণ দুই তীর
আঁধার ও আলোকে
চরণ অদৃশ্য সেতু ; আলো ও ছায়াতে
মাঝে বয়ে যায় স্বপ্নের মোহন তরী,
ঢেউ লেগে ওঠে কেঁপে কেঁপে !
পূবের রূপালী আলো ঘন মেঘে ঢাকে, বলে বেলা শেষ।
নির্জ্জন কারাতর, আর্ত্তকণ্ঠে ডেকে ফিরি—
আজও কি পাবনা উত্তর ?
দুদিনের মাঝে দুঃখ কি হবে শুধু সাথী ?
দু চোখের আঙিনায় শুধু জলছড়া ?
সত্য কি হবে অশ্রুতে জ্বালা বাতি ?
জীবনের বেলা ঘরে। স্মৃতির জমানো কড়ি গুণে—
সীমাহীন বেদনার ক্ষীণসুতো দুহাতে গুটাই
দিবা অবসানে।
হে অরূপ, ধরা দাও, ধরা দাও,
হেরুক আকুল আঁখি সুখে দুখে সর্বত্র তোমার
অনন্ত অলৌকিক মাঝে, লৌকিক চেতনা
মুছে দাও করুণা নির্ঝর।
কৃপা করো এ আঁধারে, করুণা কিরণে।
উদয় শঙ্খে বাজে তোমার জয়,
নিখিল বিশ্বে হে প্রেমময়।

নির্বাণ-ষটকম্ / ভগবান শঙ্করাচার্য্য

অনুবাদক : শ্রীতারা কুমার মিশ্র

মন, বুদ্ধি, অহংকার চিত্তাদিও নহি আমি,
শ্রবণ-রসনা নহি, নহি আঘ্রাণ-নয়ন।
ব্যোম নহি, ভূমি নহি, নহি তেজ-বায়ু,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।১।

প্রাণ মোর নহে নাম, নহি পঞ্চ-বায়ু,
সপ্তধাতু পঞ্চ কোষ কিছু নহি আমি।
বাক্ পাণি পদ নহি, নহি উপস্থ বা পায়ু,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।২।

নহি পুণ্য, নহি পাপ, নহি সুখ-দুঃখ,
মন্ত্র নহি, তীর্থ নহি, নহি বেদ যজ্ঞ।
ভোজ্য ভোজন নহি অথবা ভোগকারী
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।৩।

নাহি মোর রাগদ্বেষ, নাহি লোভ মোহ,
মদভাব-সদা-মোর, নাহিক মাৎসর্য্য।
ধর্ম্ম অর্থ নাহি মোর, নাহি কাম মোক্ষ,
সৎ চিৎ-আনন্দ-আমি, আমি শিবরূপ।৪।

মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ নাহি কিছু মোর,
পিতা মাতা কেহ নাহি অথবা জনম।
নাহি বন্ধু, নাহি মিত্র, আচার্য্য বা শিষ্য,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।৫।

নির্বিকার নিরাকার আমার স্বরূপ,
ব্যাপ্ত চরাচর আমি সর্বেন্দ্রিয় গ্রাম।
বন্ধ মুক্ত কিছু নহি, নাহি কোন ভীতি,
সৎ-চিৎ-আনন্দ আমি, আমি শিবরূপ।৬।

শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্নের স্থান দর্শন

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের পদচিহ্নের অনেকটি স্থান ঠাকুর বন্দনপুর প্রভৃতি দর্শন বিবরণে বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বালা কৈশোর কালের লীলা স্থান কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছিলাম সম্প্রতি (ইং ১৯৭৭ বাং ১৩৮৪ সালের অক্ষয় তৃতীয়া বৈশাখমাস)। সেই উপলক্ষে কামারপুকুরের সর্বজনের প্রিয়পাত্র পদাধর চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম সিহড় দর্শনের সুযোগ হয়েছিল।

সিহড় গ্রামখানি জয়রামবাটীর পশ্চিম দিকে। জয়রামবাটী গ্রাম শ্রীপদাধরের শ্বশুরবাড়ী হলেও সে গ্রামটি শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী সারদাদেবীর আবির্ভাব আর লীলা স্থান রূপেই সর্বজনের দর্শনীয় আর শ্রদ্ধার আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে। সেই পুণ্য পল্লী জয়রামবাটীতে মাতা সারদার নামাঙ্কিত মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার (১৯২৩) স্মারক তিথিটির শুভলগ্নের প্রভাতীসুরের সানাইয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সূচনার সঙ্গেই আমাদের যাত্রা সুরু হয়েছিল সিহড় দেখবার জন্য।

জয়রামবাটী গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার আধুনিক পরিচয় "মায়ের দীঘির" উত্তরদিকে লাল কাঁকুরে রাস্তা ধরে চলতে সুরু করেছি সিহড়ের দিকে। বর্ষারম্ভের বৈশাখে, বর্ষণ স্নিগ্ধ কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটতে সুরু করেছে। সরু সবুজ পাতার উপরে থোকা থোকা ফুলে, লালে লাল পুব আকাশে অরুণোদয়ে যে শোভা আরম্ভ হয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি এই কৃষ্ণচূড়া তার শিরোশোভা গ্রহণ করেছে। জয়রামবাটী গ্রাম পাদচারণ শেষ করে সিহড়ে প্রবেশের প্রথম দর্শন হল "শান্তিনাথ" শিবমন্দির। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভার পরিবেশে এই ছোট মন্দিরটি 'রাঢ় বঙ্গের চারকোণ নামানো। সাধারণ শিবমন্দির গঠনের ব্যতিক্রম এখানে। উৎকল দেশীয় মন্দির-স্থাপত্য-শৈলী প্রভাব এ মন্দিরটিতে। বর্ষশেষে গাজনের বেলার অবসান হয়েছে, তারই নিদর্শন রয়েছে এখনও মন্দিরের গায়ে। মন্দির শীর্ষের লাল পতাকা এখন মলিন হতে চলেছে। এই সিহড় শান্তিনাথ মন্দির আঙিনায় সারদা পদাধরের প্রথম দর্শন হয়েছিল আকস্মিক ভাবে।

সেই অতীতের শিশুসারদা আর কিশোর পদাধরকে স্মরণ করে চলতে সুরু করলাম সিহড়ের হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় বসতবাটী দর্শনে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক হৃদয়রামের গৃহ দর্শনের আশায় আমার হৃদয়ও উৎসুক। চলার পথের পশ্চিম ধারে অপূর্বদর্শন একটী সরোবর, তাতে "ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর, ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর" তারই পরিপূর্ণ বিকাশ এই পল্লীপ্রান্তে।

বাঁকুড়ার শুকনো ডাঙার দেশে এ সময়ে যে এ রকম অফুরান্ত রক্তকমল শোভিত সরোবর দর্শন হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কমল আমার মনকে কোমল করল। ইচ্ছা হল নিজ হাতে তুলে নিয়ে শ্রীহৃদয়রামের অভিনয় লীলাকারী শ্রীপদাধরের পাদপদ্মে শত পদ্ম সমর্পন করব। জলে নামতে আরম্ভ করলাম এমন সময়ে এক মলিন বসনা গ্রাম্য নারী এসে বলল—নামবেন না বাবু, এ জলাতে কত কী আছে। আপনাদের দরকার থাকলে আমিই আপনাদের জন্য পদ্মগুলি তুলে দেবো।

গ্রাম্য নারী কোমর জলে নেমে পূর্ণ বিকশিত অর্ধ বিকশিত প্রচুর পদ্ম আহরণ করল। আমি দুহাত ভরে সেগুলি গ্রহণ করে নিলাম। আমার সঙ্গী যতন কুমারও যত্ন করে অনেক পদ্ম গ্রহণ করল। আমরা এবার উপনীত হলাম হৃদয়রামের ভিটায় শ্রীপদাধরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী হেমাঙ্গিনীর কনিষ্ঠপুত্র হৃদয়রাম বয়সে মাতুল পদাধরের একটু ছোট। কিন্তু দুজনের ভাব ভালবাসা ছিল গভীর। তাই দিদির ভাগ্নের আকর্ষণে বহুবার সিহড়ে শ্রীপদাধরের আগমন হয়েছিল।

অতীতে ঐ মুখোপাধ্যায় পরিবারের যে সমৃদ্ধি ছিল ইদানীং তার অবনতি ঘটেছে। হৃদয়ের গৃহে একালে দুর্গোৎসব হত। যে পূজা প্রাঙ্গণে শ্রীপদাধর উপস্থিত ছিলেন সেই মণ্ডপ এখন নিশ্চিহ্ন। গাছ গাছড়ার আড়ালে সেই বোলাভিটটি, অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঐ বোলা ভিটের পশ্চিমে হৃদয়রামের বংশধরদের বাসস্থান। স্থানীয় রীতিতে তৈরী

মাটির ঘর। কোনটাতে খড়ের ছাউনি আবার কোনটায় টিনের চালা।

হৃদয়রামের প্রপৌত্র অর্থাৎ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় অতি যত্ন সহকারে শ্রীগদাধরের বাল্যকালের হাতে লেখা একখানি চণ্ডী গ্রন্থের অংশ আমাদের দেখালেন। ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে পাতাতে। ঐ পাতা মনে হল সে কালের তালপাতা। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে নিরক্ষর বলেন তাঁদের চৈতন্য উদয়ের জন্য শ্রীগদাধরের মুক্তার মতো সুন্দর হস্তাক্ষর দর্শনে আমরা ধন্য হলাম। আর যে সব সদ্য কোটা পদ্ম আমরা সংগ্রহ করে এনেছিলাম সে সব দ্বারা ঐ হস্তাক্ষর রক্ষণ পাত্রে সমর্পন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

এরপরে অপর দর্শন। হৃদয়রামের শিহড় গ্রামের উত্তরে শ্রীমা সারদার মাতা ; মাতামহীদের ভিটে এবং আন্দাপুকুর দর্শন করতে চললাম। ঐ পুকুরের পাড়ে কয়েকটি পুরানো কালের বেলগাছ। মা সারদার মাতুলেয়ী শ্যামাসুন্দরী একটী বেলগাছ তলায় শৌচ করতে এসে অনুভব করলেন, একটী হাওয়া তাঁর ভিতরে প্রবেশ করছে। ঐ ঘটনাই হয়তো সারদামণির আবির্ভাবের পূর্বাভাস। অতীতের সে বেলগাছটি নেই বটে, কিন্তু তার বংশধরগণ সে স্মৃতি বহন করে চলছে। আন্দাপুকুরটী এখনও সারা বছর জল ধারণ করে মজুমদার বংশের কীর্তি ঘোষণা করে। গ্রীষ্ম-কালে গ্রামের গরুগুলি এখানকার আন্দাদীঘির জলপান করে পিপাসা মেটায়। আর নবাগত দর্শকগণ দেখতে পায় প্রাচীনকালের পাথরের তৈরী একটী তুলসীমঞ্চ। ঐ মঞ্চেই গ্রামের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। আমরা এখন সে তুলসীমঞ্চকে প্রণাম নিবেদন করে, কিছু বেলপাতা তুলে নিয়ে চললাম আবার শান্তিনাথ শিবঠাকুরকে নিবেদন করতে। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শের স্থান দর্শনান্তে ফিরে এলাম, সারদা গদাধরের চরণধূলার পুণ্যস্থান জয়রামবাটীতে।

॥ আমাদের দীক্ষা দাও ॥

অচিকেতা ভরদ্বাজ

নদীর জলের মত প্রবাহিত শুভ্র তোমার সন্ন্যাস
সুবাসিত অন্ধকারে আলোর আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছল
ছল বয়ে চলে যায়
এ ক্ষু-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করে
দূর বড় সমুদ্রের অভিমুখী। অথচ এ পথে পথে প্রসন্ন বিন্যাস,
সুনিপুণ সঙ্গীতের জীবন রচনা, নীল আকাশের গায়ে
স্থিরতম তারাগুলি শুধু তাদের ঝলমল করে
যেন সে ঘোষণা করে অন্য এক জীবনের উজ্জ্বল বিশ্বাস।
আমাকে তোমার সেই বিবিক্ত বর্ণাশ্রমে, শুভ্র সন্ন্যাসে
দীক্ষা দাও। আমি এই জীবনের গান গেয়ে গেয়ে অকাতর
জীবন পেরিয়ে চলে যেতে চাই তোমার মতন।
আমার রক্তের সব দীপগুলি, অকাল বিশ্বাসে,
আমার স্নায়ুর সব ধূপদান জেলে দাও, সমস্ত বুকের বিবর
আলোকিত সমস্বরে সমর্পিত হোক—দেহ-মন
রূপময় এ পৃথিবী—শুভ্রতম অভিচেতনায়
ধরা দিক : আমার এ দুচোখের দৃষ্টির বিস্ময়
অবিরাম প্রস্ফুটিত হয়ে থাক—অনির্বাণ আমার হৃদয়।

সুখেদুঃখে স্বপ্নে সাধে বিজড়িত প্রত্যহের পথের মাঝার
আমি যে ছিন্ন ভিন্ন রিক্ত এক পদাতিক,
উদ্দাম সংগ্রামে মুখর :
কোনো কিছু করতে গেলে, এমন কি স্রষ্টার আসনে
বসতে গিয়ে কখন যে মঞ্চের বিপন্ন তুলীলব
হয়ে পড়ি। কখন কী হয়ে যায় নিজেই তা বুঝতে পারি না,
এক সর্বগ্রাসী ঝড়
কখন আমাকে এসে আক্রমণ করে যায়। তার চেয়ে এই নবাসনে
শুয়ে থাকা ঢের ভালো, তারচেয়ে তোমার এ বিজয়ী পরাভব
প্রার্থিত। আমাদের দীক্ষা দাও তোমার ঐ সজ্জল সন্ন্যাসে
বেঁচে থাকি বিবিক্ত সম্রাটের মত
আত্মার বিশ্বাসে
পৃথিবীরই পদাতিক অন্য এক আকাশের কাছে অনুগত।

ভক্ত চারণবৃন্দ

ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি—"আমার আর কিছু থাক আর না থাক কিন্তু গান থাকবে।" ঠাকুরের প্রকট হবার সময় থেকেই ঠাকুরের গানের ধারক ও বাহক ছিলেন বিশেষ যে দুটী চারণ—কোরিয়া নিবাসী শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীগোঁসাই ও বাঁকুড়ার সোনামুখী নিবাসী শ্রীকামিনী দেবাংশী—তাঁরা উভয়েই অতি উঁচুদরের ও বীরকুমের বিশেষ নামকরা সুরকার ছিলেন। এঁদের নিজেদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক যত ছিল আবার ঠাকুরের গানের সুর নিয়ে বাদ বিসম্বাদও ততই ছিল। উভয়েরই তবলাসঙ্গতকার ছিলেন বাতিকারের কুমিঠা গ্রামের শ্রীবনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুর বড় ভালবাসতেন এঁদের। আদর করে ঠাকুর এই তিন ভক্ত শিল্পীর নাম দিয়েছিলেন "চারণ ভক্ত"। শ্রীবৈদ্যনাথ ও শ্রীকামিনী দেবাংশীর দেওয়া ঠাকুরের বহু গানের সুর আজও কানে লেগে আছে। গভীর রাতে রাসবনে নদীর চরে শ্রীগোঁসাই-এর কণ্ঠে "অমাশ্লিষ্ট ঘন রাত্রি" ও শ্রীকামিনীর "বাংলা মাটির মা যে গো তুই" বা "পঞ্চবটীর বটের মূলে আর যা বলে কে পড়বে চলে" ইত্যাদি গানগুলির সুর অমর হয়ে আছে। সিউড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরভারতীর প্রতিষ্ঠাকল্পেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঠাকুরের এই তিন চারণ ভক্ত। আমাদের গর্বের বিষয় যে, তাঁদেরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় লখনৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের "সঙ্গীত বিশারদ" উপাধি লাভ করেছিলেন।

বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে, গত দু বছরের মধ্যে আমরা তিনজনকেই হারিয়েছি। এঁদের মধ্যে অতি সম্প্রতি হারিয়েছি শ্রীকামিনী দেবাংশী ও শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। তবে আমাদের বিশ্বাস, তিন শিল্পীই শ্রীঠাকুরের চরণে গিয়ে ঠাকুরকে গানে তৃপ্ত করছেন। শ্রীবৈদ্যনাথের মৃত্যু তো একটি সাধুর মৃত্যু। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে প্রথম আক্রান্ত হয়ে সেই দিনই একটু সামলে উঠে ছেলের কাছ থেকে নিজের জপের মালাটি চেয়ে নিয়ে বসে বসে কিছুক্ষণ জপ করে নিজেরই সুর দেওয়া ঠাকুরের "ব্যথার রঙে রাঙাবো আজ প্রাণের ঠাকুরে" গানটি গাইতে গাইতে আবার অজ্ঞান হয়ে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি। সেই অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তাঁদের অমর আত্মা পরমাশ্রয় শ্রীঠাকুরের চরণে চিরশান্তি লাভ করুক। ঠাকুরের চারণ দলের জয় হোক।

———

অলোক অগম্য

মীরা রায়

শব্দহীন এক মহাজাগতিক
স্পন্দিত চিত্রময়
ওঁকারে প্রতিধ্বনিত চরাচর
কান পেতে শুনতে পাবেনা তাকে
অনুভবে পেতে পারো প্রত্যয়
গতি তার আলো ও শব্দের অতীত
হৃদয়ে ধমনীতে বয়।

তারায় তারায় অসংখ্য সূর্যালোকে
হয়তো বা রাখে পরিচয়
যেখানে জীবনের ছোট ছোট সীমায়
অসীমে সময়য়
যেখানে তুমি নেই আমি নেই
তবু কিছু থেকে যায়
অলোক অগম্য এক জ্যোতি সমুদ্রের ঢেউ
চেতনায় শব্দব্রহ্মের অব্যয়।

পুণ্য শপথ নাও

স্বামী অরূপানন্দ

সৃষ্টিরে তুমি করেছ মহান
ওগো সর্বেশ্বর
গরিমা তোমার দিকে দিকে তাই
এনেছে অমৃত বর
জলধি আকাশ গিরিশ্রেণী ছুঁয়ে
তোমার মহিমা গাথা
প্রাণে প্রাণে জানি তুমিই রয়েছ
তোমারই আসন পাতা।
তবে কেন হায়, এত ভেদাভেদ
এত গ্লানি চারিধারে
মিথ্যা মুখোশ প্রগতির চাপে
বিবেক লুকিয়া মরে।
তোমার গড়া এ নিখিল ভুবনে
আগুন ধরায় যারা
জ্বলে যাক্ তারা তীব্র দহনে
হউক না দিশাহারা।
ধূম্রকেতুর ভয়াল ভ্রূকুটী
পড়ুক তাদের শিরে
কালীয় নাগের বিষ নিঃশ্বাসে
সব বিষ যাক্ পুড়ে।
দলিত দলনে উন্মাদ যারা
রাখ তব কারাগারে
এ মাটীরে আর কোর না সিক্ত
আর্ত অশ্রুনীরে

ক্ষুধিত তৃষিত নিপীড়িত যারা
তাঁদের বাঁচিতে দাও
মনের নেশায় অত্যাচারীর
দম্ভ গুঁড়িয়ে দাও
সারাটা বছর রোদে জলে পুড়ে
আহার যোগায় যারা
তারা কি পাবে না সুখার অন্ন
তাদের দেবে না সাড়া?
ভিখারী শিবের ভিক্ষা কি তবে
নিষ্ফল হয়ে যাবে?
অন্নপূর্ণা মায়ের মহিমা
কেমনে বল মা রবে?
বক্ষ পাঁজর গিয়ে গড়া যত
উঁচু উঁচু মসনদ
ছুড়ে ফেলে দাও কে পারে রোধিতে
আছে কার হিম্মৎ।
চাই না চাই না মিথ্যা মুখোশ
শ্মশানের সভ্যতা
বেদনার তারে দেখ কাঁদে আজ
বসুন্ধরা এ মাতা
কে কোথায় আছ বীর সন্তান
এস এস এক হও
মায়ের অঙ্গ মোছাতেই হবে
পুণ্য শপথ নাও।

"ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত—
ভুলিও না অন্ন মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই"

—বিবেকানন্দ।

গান

কথা ও সুর : শ্রীঅর্চনাপুরী

পরজ পরজ ঘন বাদল বরসে
বাজে মেঘ সিতার
বিরহী মন আজ গাহে হৈ প্রভু
সুর-ভাঁজ মল্লার ।

মধু মালতীকে ফুল ভী ঝুমে
ঝুমে ঘুঁহী চামেলী
চমক চমক কর কহতী বিজলী
অঙ্গনা কিউ আঁধিয়ার ।

ঈসাস ভরে আজ পবন ঝকোরে
সন সন সন সন বোলে
প্রেম ঝরোখে পাস পুকারে
বন্ধ না করনে দেতে দ্বার ।

গগন ভুবনমে ইতনী আকুলাঈ
বিকল কতী ক্যা হোতী
মৈঁ আহুঁ মেরে মিলন সুন্দর
বিরহা মলীকে পার ।

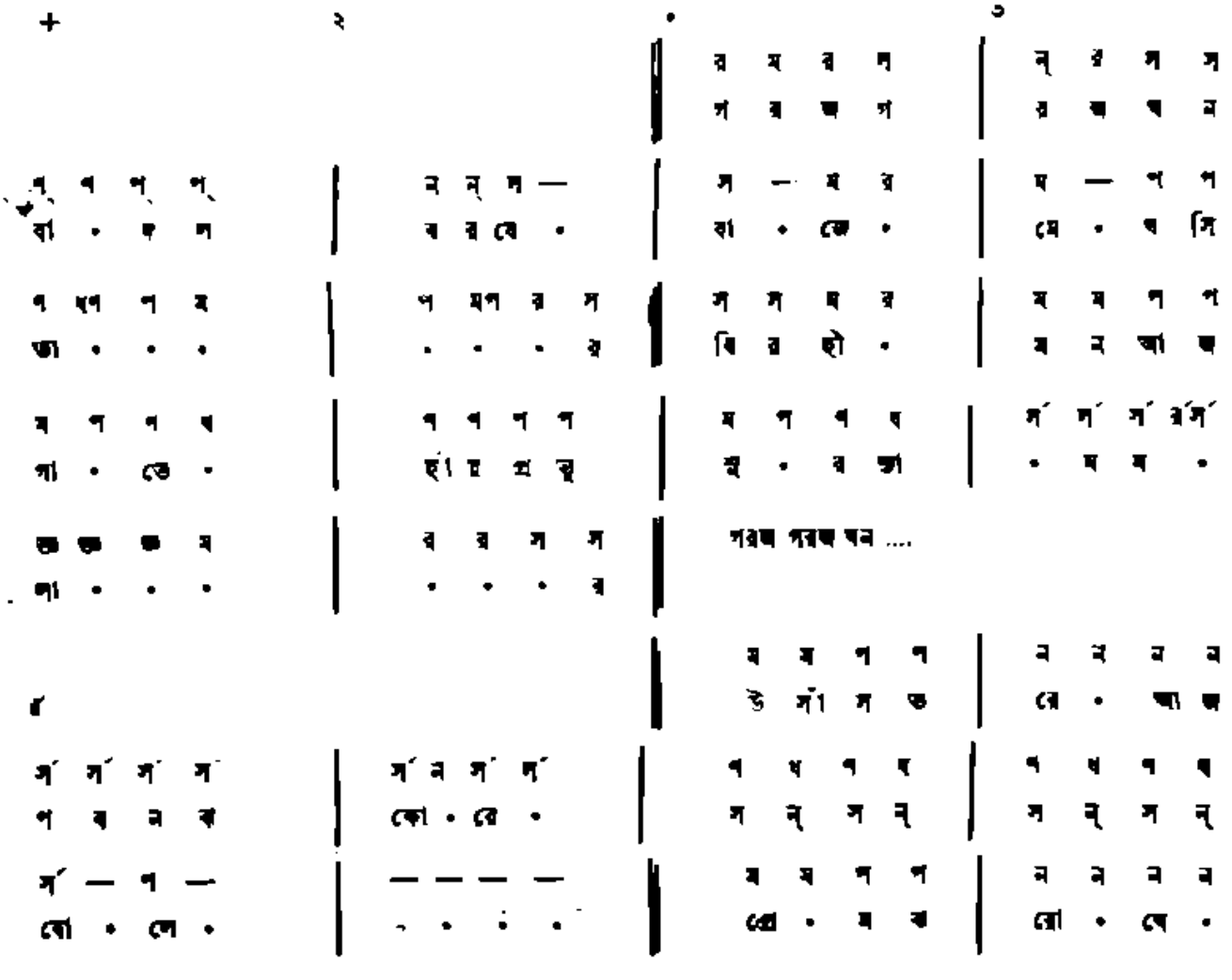

+ ০ - ০

ন র্ র্ র্	র র্ র্ র্	প ধ প ধ	প প প প
পা • ন পু	কা • রে •	ব ন্ ধ মা	ক র মে •
ম ম প প	র্ র্ ঋ ঋ	পরও পরও ঘন ...	
মে • তে •	ঝা • • র		
		র র র ঋ	র স স র
		ম ধু মা •	ল তি কে •
প প স র	র র র র	র প প প	ম গ র স
ছু • ল তি	কু • মে •	ঝু • মে •	ঘুঁ • ছি চ
র ঋ র —	— — — —	প ফ প ফ	প ফ প ফ
মে • লি •	• • • •	চ ম ফ চ	ম ফ ফ র
প ফ প ফ	প প প ফ	প প প ফ	প প প ফ
ফ ছ ঐ •	বি ঋ লী •	ঋ ঋ ন্া •	কি উ র্ঁ ধি
ঋ ফ ফ ফ	— — — —	প প প ফ	প প প ফ
ছা • • ং	• • • •	ঝা ঙ মা •	কি উ র্ঁ ধি
প প প প	— — — —		
ঝা • • র	• • • •		
		ম ম প প	ন ন ন ন
		প প ন ছু	ব ন মে •
র্ র্ র্ র্	র্ ন র্ র্	প ধ প ধ	প ধ প ধ
ই ও নী অ	কু • লা ই	ধি ফ ল ফ	ভি • ক্যা •
র্ — প —	— - — —	ম ম প প	ন ন ন ন
ছো • ত্তী •	• • • •	ঝাঁ ঙ ফা •	ছ • মে রে
— র্ র্ ঋ	র্ র্ র্ র্	প ধ প ধ	প প প প
• মি ল ন	ম্ ন্ ধ র	ধি ঙ ছ ন	লী • কে •
ম ম প প	র্ র্ ঋ ঋ	পরও পরও ঘন —	
পা • • •	• • • র		

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

Individual differences in ability :

1. Individual differences are found in all psychological characteristics which are physical abilities, mental abilities, knowledge, habits, personality and character traits.

2. Woodworth is of opinion that ability has three meanings :

i) achievement is actual ability which can be measured by direct tests,

ii) Capacity is potential ability, which can be inferred from unequal capacity of individuals under equal intensive trainings and experiences,

iii) Aptitude is the achievement that can be predicted and measured by special and devised tests.

3. Testing is interpreted by comparison to a standard or by comparison to scores of a group of individuals :

a) The normal distribution is bell shaped and symmetrical,

b) The raw score is in terms of number of items completed or speed of doing a specific task or accuracy of performance,

c) Standard score is the deviation of the individual score from the average divided by standard deviation,

d) Gentile score is the percentage of all the scores which is surpassed by the particular score.

4. Intelligence is the general ability to solve intellectual problems on the basis of past learning and present hold in essentials :

a) Feeble-minded have three classes—moron, imbecile, and idiot,

b) Geniuses are of exceptional intelligence who under favourable opportunities reach outstanding intellectual achievement.

5. The intelligent tests are standardised objective measures of individual achievement.

a) Binet test is an individual examination. There are items graded in difficulty and arranged in groups corresponding to the average level of children of each age,

b) Performance tests are concerned with non-verbal materials,

c) In group tests there are short-answer items that can be given to many persons simultaneously.

6. Intelligent test scores of children can be given in ralation to age norms as well as in standard scores or centile scores.

a) Mental age is the score of a child who passes all the test items which a normal child of a specified age passes.

b) Intelligent quotient is got by dividing the mental age by the chronological age It is the relative brightness of a child which remains more or less fixed for his life.

7. Growth of intelligence continues up to 13 or 15 or even up to 18 when the growth stops.

8. Distribution of intelligence with population confirms to the normal curve and the brightness of any individual depends on the relative position of the individual on the curve.

1. Some individuals are of immensely greater ability than others.

a) The name idiot savant is given to men who are feeble-minded but possessing high ability in one special line.

b Arithmetic-prodigies are normal in general ability, but are remarkable in mental calculation.

c) Reading disability is found in children who have higher I. Q.

2. Correlation is a measure of the degree of correspondence between the standings on two tests of a group of individuals. Perfect correspondence is represented by the correlation of +1·00 and perfect reverse correspondence is—1·00.

3. The degree of correlation between two tests indicates the degree of identity or overlap in the measured abilities.

a) When most correlations are low the assumption is this, that there are more specific abilities.

b) When there are most correlations that are positive, the indication is that there is a general ability.

c) When the group tests correlate high with each other but low with any other test, there is indication of group factors—abilities of intermediate scope :

Examples of this include :

1) Verbal ability
2) Number ability
3) Spatial ability

d) Correlation between special abilities is greater in children than in adults which may be due to difference in training and acquired interest.

4. Prediction of vocational success can be partially based on the use of aptitude tests which are measures of present ability designed to predict future achievement with training.

a) Aptitude tests if they need be useful must be well done and standardised.

b) Reliability of the tests is necessary.

c) Validity—is by eventual success and failure.

d Prediction of school success on intelligence test scores is important.

e) Prediction of piloting success in tests which are eighteen in number, has higher validity.

f) Aptitude tests for selection of employees and for.

g) Vocational guidance are being tried.

Book Review

'Sabari Prithibi Jage'—by Santasil Das

Sahityasadan, A 125 College Street Market, Cal-12 : Price—Rs. 4·00

'Sabari Prithibi Jage', a Bengali poetical works rendered by the eminent poet Sri Santasil Das has her serene appeal to the humanity. We know the legend of Sabari who had waited for Bhagawan Sri Ramchandra for a long period. The poet wrote in the poem 'Sabari Prithibi Jage' :

'Sakali agyat, tabu abisranta mantra uchcharan :
Antarer antarete Jage nitya sundarer nam.'

In comparison with the Vaishnaba lyric of Sri Chandidas we can quote his famous stanza :

'Sai Keba sunaila Shyam nam
Kaner bhitar diya marame pashila go
Akul Karila mor pran.'

Chandidas wrote this 'pada' in a lyrical way through her 'Radha'. The poet Sri Santasil Das has also expressed his lyrical tendency through his 'Sabari'.

We smell a mystical fragrance in the emotions of his lyrics which he has recollected in his tranquility. (Ref. Wordsworth).

The poet composed one hundred lyrics in this book. The poet not only dreams of 'Sabari' but he is also conscious of 'Hirosima'. Thoughts of old and new days have captured his mind. Though he sometimes suffers from frustration in the poem 'parinati, tabu', yet he possesses an optimistic view of life in the poem 'Jivan jagate habe' :

"Buk bhare nou alo ar sei alo jane jane
diye jau jata paro, tabe habe sarthak
jeevan."

The get up of the book is presentable. The binding of the book is very good. Hope that this book of poems styled as 'Sabari prithibi jage' written by the poet Sri Santasil Das will appeal to the heart of the readers of literature.

--S. Neelananda

The Desire of the Flute

[English rendering of **Sree Archana Puri's** Bengali "**Banshir Sadh**"
by **Sri Jyotsna Nath Mallik.**]

Bring me forth this time as a real flute sure,
not in other hands, let me sound alone in your.
Striking the bamboo clump make as small,
shall be filled with a little tune, make me not tall
In the palace let the **sanai** blow in golden orchestra loft,
at the touch of your golden finger, I'll grow ecstasy soft.
What if none listens to the music, cows in the fields will hear.
the eyes of grass flowers will moisten, **Broja** dust redness wear.
Let the firmament glow like thousand lamp chandelier,
in my song in the mud-hut a speck of glow-worm appear.
Let the unuttered sound from depths of seven oceans,
touching the sun in another side rise in vibrations.
The light touch with a sweet whiff in the heart of seven holes,
I would write the fairy tale in secret of the seven tones.
This dry bamboo flute will not adorn the council stand,
lovingly it will lie sidelong in your little hand.
It will speak in your mouth, will hear from your lips
While parting throw it away in the blue Yamuna deep.
Truly this time you bring me forth as a truthful flute
I will live in your love, again die loving you.*

Original Bengali poem was published in Bhabmukhey —
Chaitra, 1384 B. S.

Fundamentals of Shakta-Sadhana

S. N. Bagchi
(Formerly a Judge of the High Court, Calcutta)

[19]

In describing the quintessentials of the occult process of Loya i. e. Kundalini Yoga, or as matter of that yoga Sree Aurobindo says "In Yoga also it is the Divine who is the Sadhak and the Sadhana ; it is his Shakti with her light, power, knowledge, consciousness, Ananda, acting upon the adhara and, when it is opened to her, pouring into it with these divine forces that makes the Sadhana possible. But so long as the lower nature is active the personal effort of the Sadhak is necessary. The personal effort required is a triple labour of aspiration, rejection and surrender." (The Mother—7).

The Divine force i. e. Kundalini is an instrument of the spirit in the being that as the inner warrior within the self of the Sadhak fights against obscurity and false-hood and preserves a faith unshaken by disappointments and difficulties, and carries on the Sadhaka through enormous ordeals to the supreme victory and the great transmutation. For such supreme victory and transmutation, the prayer to the Mother Divine in Sree Sree Chandi—"Argola Stotra" has it as the burden of the song :—

"Rupam Dehi" "Jayam Dehi", "Yaso Dehi," "Diswa Jahe".

The above Prayer is a call by the Sadhak for bestowal of Mother's power of grace and protection through Her Divine Sakti, a little of which will carry the Sadhak in the way of his Sadhana through all difficulties, obstacles, and danger, and will turn difficulties into opportunities, failures into success, and weakness into unfaltering strength. From Her impersonal core of Transcendence, the Divine-Shakti i. e. Kundalini Mahamaya in her personal aspect of "Jiva Kundalini" has stooped to descend into the darkness of the being of a Sadhak that She may lead him to light through the wrappings of falsehood and error in the self of the being of Sadhak's earth-nature, that she may convert those to Truth, that She may turn mortal life to God-like life in this world of pain and its obstinate sorrow and suffering, and that she may end all those in the transforming ecstasy of Her Sublime "Ananda" i. e. Bliss.

In verse 52 of "Sat-Cakra Nirupama" the final stage of the Loya Yoga i. e. the Samadhi Yoga of Kundalini has been described. The wise and excellent Loya-Yogi should lead Jiva Kundalini along with Jiva to Her Lord, the Para-Siva in the abode of Liberation within the pure Lotus i. e. "Sahasrara", and mediate upon Her who grants all desires as the Caitanya-rupa-Bhagabati. When he thus leads Kula-Kundalini i. e. Jiva-Kundalini he should make all things absorb into Her. Sadhak should meditate upon Kundalini as Suddha-Caitanya Rupa-Pure consciousness, and a form of the Divine. He will thus realise the identity of Jiva, the self of the being in nature, with Atma, the Being-Consciousness itself i. e. with Cidatma i e with Bramhan—that is Soham or Saham—"I am He" or "I am She". Having dissolved

the Citta, he remains unmoved by reason of his full and all pervading knowledge. Sankaracharya said about this state of ecstasy as "I am that which alone is sat without any second (Advaya). I am supreme Bliss wherein is all bliss and Vasudeva's very self, I am "Om". Let not mind be distracted when it is absorbed in Cidatma. Let him (Sadhak) rest in the fullness of his illumination like a deep and motionless ocean" (Serpent power 52-5223). It is noticeable in verse 52, that an worshipper of any particular Ista-Devata of any particular cult is required to realise identity of Jiva-Kundalini with the Ista-Devata of the worshipper. In Pranava "OM"-worship for instance and in other forms of worship, the worshipper is to realise his identity with Kundalini, who is embodied in the forms of all the Mantras of a worshipper of any cult. Why Kundalini-Yoga, also named as Loya-Yoga is to be practised by any school of Sadhana has been elaborately explained in the commentary to the verse 52 of the Sat-Cakra-Nirupama. The details are full of technical terms and subtle Psycho-physical processes. The Mantra-Tantra-Prakasa, a treatise on Kundalini-Yoga gives a rather simple description saying "Let the Sadhak think attentively that all things i. e Tattvas beginning with Prithvi are absorbed into "Vishnu", the cause, who is Sat-Cit-Ananda. Visnu is specified by this praticular Tantar, but it may be any other Devata who is the Ista-Devata of the Sadhak (Verse 44 Sat-Cakra-Nirupama and note in page 527 of "Serpent-power").

Vaisnab Tantra accepts and advocates practice of Kundalini i. e. Loya Yoga. Kesava-Bharati, the great Vaisnava teacher, who initiated Lord Sree Caitanya, the greatest among the latter-day Vaisnavas to "Sannasaya" said about the process of Loya Yogas, "Lead Her (Unmani i. e. Kundalini) into the Male, which is Bindu, lead Bindu into Paramatma and Paratma to Kalatattva, and this latter into Sakti, and Sakti into Cidatma, which is the Supreme (Kevala), the tranquil (Santa), and effulgent, (Serpent-power 528-529) Sree Caitanya Mahapravu's "Radha-Vhaba-dyuti– Krishna-Sadhana" tells the esoterism of Kundalini-Yoga in its essence "Bhakti", the way of Love, has its place in the attitude of Loya i. e Negation or rejection as well as in the attitude of resignation to the wished for, the one and the All. In essence, Loya i. e. Kundalini Yoga proceeds by negation and resignation—the former is rejection, and the latter "Surrender" (The Mother, page 8-9)

Sankaracharya explains Loya in relation to Loys or kundalini Yoga in a very succint way saying "The gross should be dissolved into subtle and absorbed into Cidatma" (Serpent power 527) Verse 49 of "Sat-Cakra-Nirupama" speaks of Siva-Padam or State of Siva i. e. Param Akula-padam. Supreme "Siva" is "Akula" i. e. infinite consciousness, the Absolute, and "Kula" is Sakti. "Sahasrara", as the verse 49 says, is the abode of the Supreme Siva i. e. Param-Akula-padam. All Loya-Yogis, be they of Saiva or Sunya or Ganapatya or Vaisnaba or Sakta cult come to "Siva-Padam", as the V. 43 in Chap. 78, Uttar-Kanda of the Padma-Purana puts it, while practising the Loya Yogas as prescribed by several Tantras of the Agam. All the five schools of Agamic cult as named above advocate worship of "Power" by practising Loya-Yoga for attaining Siva-Padam. The verse 49 of "Sat-Cakra-Nirupama" speaks of "unmani" state of "Sakti-Kundalini" while she rests united with Param Siva in the "Sahasrara" at the final stage of realisation of a Siddaha Loya Yogi. This "unmani" state of Kundalini i. e. the heavenly Psyche of Sree Aurobindo's coinage annihilates in the

Sadhak the idea of time and space Kalaa and Kalaa. It is the body of Siva, i. e. Sivatanu, and It is then said "Unmanyante Para Sivayti. "Shakti". here is free from "Maya", and is then 'Mahamaya'—"Nityanandamoyee", Eternal Bliss. "Shakti" in "unmani" state is replete with every form of bliss i e. "Sakati-Sukha-mayan" as in Unmani State of Sakti-Mahamaya the Universe finds its rest in the abode of the Supreme Siva. Primodial Sakti, while resting in the abode of Siva in Satya Loka or "Sahasrara" united with Siva is in the form of a grain of gram as is Bramha Some again say it is "Visnu" and others again call it 'Rudra". Siva-Sakti forms a Para "Bindu" the creative unit whose nature is to create, maintain and destroy. The space in "Sahasrara" is "Siva" himself and "Bindu" is "Param-Kundalini or Mahamaya" inhereing in and with "Siva". "Bindu", the unit creative point, has a circumference which is Maha-Kundalini-Sakti possessing the three Gunas—attributes, Swatta, Raja and Tama. The Great nature—the power of spirit. The space within "Sahasrara" is both Siva and Sakti "Bindu" according to some Inswara, the cause of all, and some pauranik writers of Puranas call it, "Mahavisnu" and others call it "Bramha-Purusa.' Devi Mahamaya, as Saktananda-Tarangini Chapt. I says, "Devi Kundalini-Mahamaya without manifestation of Maya-Sakti, is Nirguna i.e. attributeless, and with the manifestation of Maya-Sakti, Saguna i.e. with attributes, while "Sarada Tilak" says the eternal Siva should be known as both Nirguna (Attributeless), "Niskala" and Saguna (Attributeful) "Sakala". He is Nirguna when dissociated from the workings of the Prakriti, the Great Nature—the Super nature, but when associated with Prakriti i.e. Maya Sakti, He is Saguna i.e. "Sakala"—Siva". The process of the rousing of Sakti-Kundalini with Jivatma i.e. Jiva-Kundalini has been elaborated in verse 50 of the "Sat-Cakra-Nirupama. In verse 51 of the said Shastra, the final approach to union, and the Union of Kundalini with Siva, have been described. In Her subtle form Jiva Kundalini is fine like the lotus fibre. She approaches Siva, who is supreme Bliss itself, and who is in "Bindu" form in the pericarp of the "Sahasrara". She brings into Sadhak the Bliss of eternal liberation "Nityananda-rupammuktam". The Kundalini having united with the Sunya rupaa—Para—Siva and having caused the Devi so united to drink excellent nector from their union, by the same way brings herself back to Kula cavity i. e. Muladhar. "Sunya" denotes "the void" the space within Bindu, the Siva who is "That" the Supreme Siva The body of the Sadhak then becomes "Deha-Devata", spiritual Body. The Sadhak is to meditate upon the Union of Siva-Sakti and be satisfied with the nector of Eternal Bliss—Ananda-Sakti which flows from such union. That psychical perception of such union of Siva-Sakti is called "Samarasya". The leading of Kundalini from "Muladhar" to "Sahasrara" requires meditation and chanting i.e. "Japa" of "Hamsa" and 'Humkara' Mantras amongst other processes. The seven planes of consciousness of Vedanta and the six "Cakras" i.e. planes of consciousness of Sakta-Tantra are conceived of on similar principles.

(To be continued)

Divinity is the end of all wisdom.

—Swami Abhedananda

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

WORLD PHILOSOPHY

by

Swami Satyananda

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M. A., Ph. D.

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা—৩৩ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৩৩—২০৮১)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী ঈশানন্দ

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য ডাঃ ৮·০০

Regd. No. W B/NC-34 • BHABMUKHEY • Phone : 52-7133

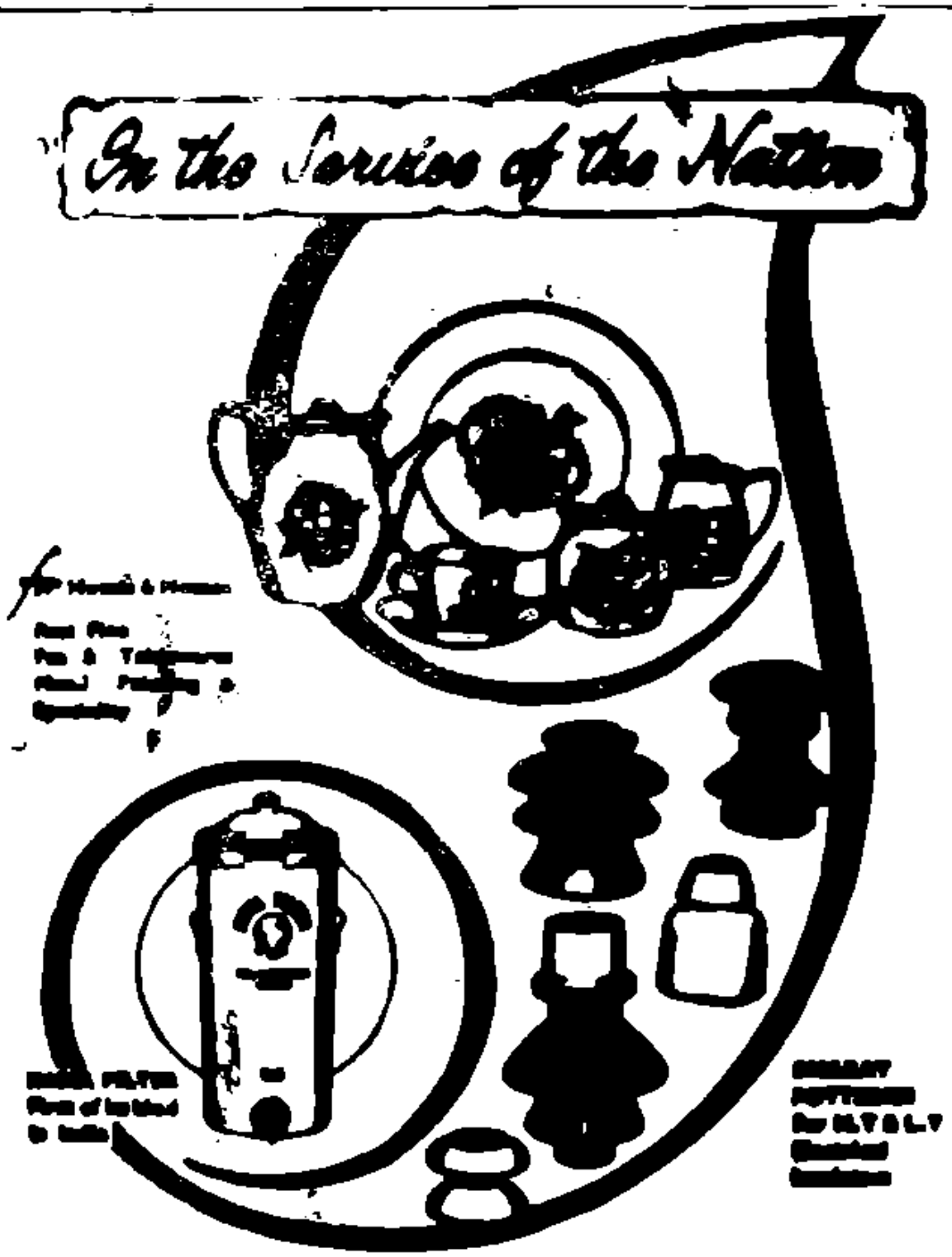

INDIA POTTERIES LIMITED
14, SHAKHTALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বালক গদাধরের বলাকাদর্শনে ভাবসমাধি।

প্রচ্ছদ-শিল্পী—শ্রীইন্দু রায়। মুদ্রক-পরিচালক সচিব - স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী উদানন্দ। যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ সম্পাদক—স্বামী ঈশানন্দ ও স্বামী মৃগানন্দ। প্রকাশ সচিব—স্বামী সদানন্দ, স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ স্বামী অমলানন্দ ও ব্রঃ তারক চৈতন্য।

ভাবমুখে

কার্ত্তিক ● তেরশ' পঁচাশি ● দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

১৯১৮ ৪ ১৯৭৮

দীর্ঘ ষাট বছর ধরে জাতির সেবায়

— নিয়োজিত —

দি হাওড়া মোটর কোম্পানী

লিমিটেড।

১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড,

কলিকাতা—৭০০ ০০১

দিল্লী • পাটনা • কটক • শিলিগুড়ি • ধানবাদ • গৌহাটী

ORPHAN'S TEA

For

Health & Economy

Phone : 26-2304

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers
PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST, CAL. 6
PHONE : 34 - 5711

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৭১১
২২-১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

কার্ত্তিক
সপ্তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীমা সারদা

ষাট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ
তেরশ' পঁচাশি

	২২১	শ্রীশ্রীঠাকুর
চিন্তা করেছ কি ?	২৩০	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
সঙ্গীত-সাধক স্বামী সত্যানন্দ	২৩১	স্বামী নীলানন্দ
বিজয়া	২৩২	শ্রীদিলীপ কুমার রায়
বয়স্কদের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও লাইব্রেরী	২৩৩	শ্রীঅমলেশ মিত্র
ঈশারসনের কবিতা "ব্রহ্ম" ও স্বামী অভেদানন্দের ব্যাখ্যা	২৩৭	শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক
বালক প্রভু	২৪০	শ্রীসুধেন্দু মল্লিক
গান	২৪০	শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী
নীল মাঝের টানে	২৪১	যোগমায়াপুরী
মাতৃকুপায়—মুক্তিতীর্থ—অমরনাথ	২৪৩	শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত
গান	২৪৪	শ্রীশরণাপুরী
অন্ধার সাথী	২৪৭	শ্রীপার্থ সারথি ঘোষ
অতঃ তিথি পূজা, মহালয়া ও মহাপূজা	২৪৫	স্বামী ঈশানন্দ
হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব	২৫০	ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু সরস্বতী
গম কী রাত	২৫৩	স্বামী মৃগানন্দ
নামের মালা	২৫৩	শ্রীআরতী বসু
তোমার নয়ন দানে	২৫৪	স্বামী অরূপানন্দ

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনব ও অসামান্য নব সংযোজন

সাহিত্যের সীমানা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কবি ও কাব্য, সাহিত্যে ঈশ্বরতত্ত্ব—চরিত্রের, বিষয়ের, আদর্শের, ভাষার ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বের ভবিষ্যৎ, শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও কাব্যবিচার, অচিন্ত্যকুমারের কাব্যে ঈশ্বরানুভূতি, সাধক কবি সত্যানন্দের কবি প্রতিভা, গ্রামের কবি কুমুদরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি ও কাব্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সংকলন।

মূল্য : ১৫·০০ টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

প্রশান্তি	২৫৪	শ্রীকৃষ্ণ মিত্র
আগমনী ও বিজয়া	২৫৫	অমৃতেশ ভট্টাচার্য্য
আদি বিশ্বময়ী জগৎকল্যাণী	২৫৬	কিশোরী রঞ্জন রায়
তুলসী তলে	২৫৬	শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন মালাকার
বঙ্গানুবাদ কথামৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	২৫৭	
শোক সংবাদ	২৫৭	
World Psychology	35	Sreemat Swami Satyananda Deva
John Milton : The Defender of Liberty of Thought and Speech	36	Shailendra Nath Chakraverty

With best Compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Haracbandra Mullck Street

Calcuttr—5

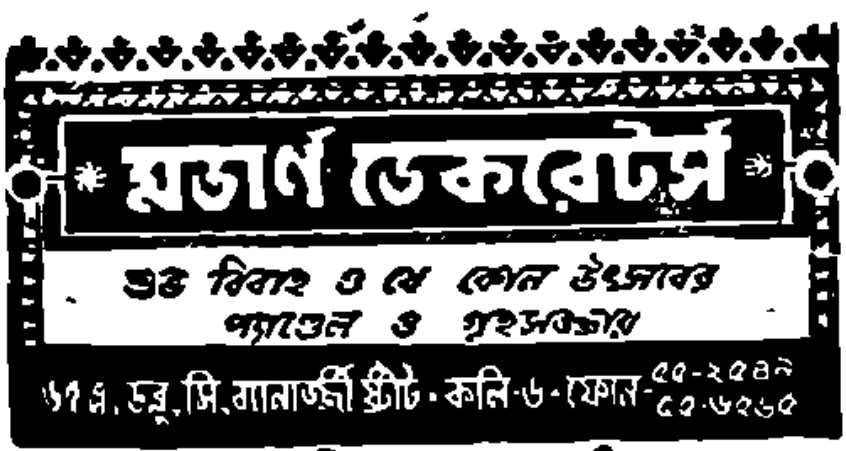

• আশ্রম পর্ব্বপঞ্জী : অগ্রহায়ণ · ১৩৮৩

২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, রবিবার= একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩০শে " ১৪ই " বৃহস্পতিবার= অমাবস্যার হোম।
৬ই ডিসেম্বর ২০শে " বুধবার= শাখা আশ্রম দুবরাজপুরে শ্রীশ্রীসারদাকাত্যায়নী দেবীর সপ্তম্যাদি পূজা সকাল ৮·০টার মধ্যে আরম্ভ।
৭ই " ২১শে " বৃহস্পতিবার= ঐ আশ্রমে দেবীর অষ্টমী বিহিত পূজা সকাল ৮·০ বার মধ্যে আরম্ভ।
৮ই " ২২শে " শুক্রবার= উক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীদেবীর নবমী বিহিত পূজা সকাল ৮টার মধ্যে আরম্ভ।
৯ই " ২৩শে " শনিবার= উক্ত আশ্রমে দেবীর দশমী বিহিত পূজা ও বিসর্জন সকাল ৮টায় আরম্ভ।
১০ই " ২৪শে " রবিবার= একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
১৪ই " ২৮শে " বৃহস্পতিবার= পূর্ণিমার হোম।

• বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM : DISWASHING　　PHONE : Office : 24-1236, Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-16
Works : 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত
শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ
করুণাবতার
শ্রীশরণাপুরী　　মূল্য : ১১·০০
প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি-৩৬

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTUBED BY :

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA.
CALCUTTA-56

Phone : 58-1578

ফোন : ৪৪-১৯৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-১

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৯০ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

ALSO

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS

OF

ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

Head Office :
N. G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 42-5197

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah. (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ	তেরশ' পঁচাশি	কার্ত্তিক	সপ্তম সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রী ঠাকুর

ওমা জল ভরেছিস, দুই নয়নের কোণে
মায়ের মায়া কতই মায়া জানে ॥
করুণ দুটি আঁখির কোলে মায়ার সায়র ঐ উছলে
শত সুধার সায়র সেঁচা তোরে কে গড়েছে মা
মন হারাতে মনে মনে ॥
মায়ের সোহাগ ঠিকরে পড়ে আলোয় কালোয় ঝরঝরে
স'রে স'রে থেকে থেকে এমনি করে নিস মা টেনে
ভুলতে নারিস এই গহনে ॥

চিন্তা করেছ কি ?

শ্রীঅর্চনাপুরী

আজ হ'তে শতবর্ষ পরে
বাঘেরা লিখবে মানুষের ইতিহাস
বলবে তারা ধারালো হিংস্র নখে
নিজের ভাগ্যের কবর নিজেরাই খুঁড়েছে
যে গহ্বর থেকে উঠে এসেছিল
কালীদহের বিষজল।
সে ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে ছিল লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত প্রাণ
তারা খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছে
তাদের চাহাকার আকাশে পৌঁছয়নি
কোথায় তলিয়ে গেছে মিলিয়ে গেছে
কেউ তা জানে না।

আজ হতে শতবর্ষ পরে
সমাজের নীতির তুলাদণ্ডে ওজন হবে
মানুষ আর পশুর বিদ্বেষের ইতিহাস।
নিক্তির কাঁটা হয়তো লজ্জা দেবে মানুষকে
দেখা যাবে শ্বাপদের হিংসার আছে
একটা সীমিত গণ্ডী, যার নাম জঙ্গল।
বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে তারা বলবে
আমাদের হিংসাকে আমরা ঢাক পিটিয়ে
প্রচার করিনি।
তোমাদের হিংসাকে তোমরা বিক্রী করেছ বাজারে হাটে
যে বাজারের রং আন্ধারের মত কালো

বিজ্ঞানের অনুবীক্ষণে সাপের মত চোখ রেখে
তোমরা আবিষ্কার করেছ সৃষ্টিকে নয় ধ্বংসকে।
রক্ষকের ছদ্মবেশে ভক্ষক হয়ে
পৃথিবীর অর্দ্ধেকটাই করেছ ভক্ষণ।

আজ হতে শতবর্ষ পরে
সত্যই যদি আসে সেই দিন
হে আজকের মানুষ তোমরা আশ্চর্য্য হ'য়ো না
শুধু চেষ্টা কোরো অনুতপ্ত হ'তে।
আজকের ইতিহাসকে ঢাকতে চেয়ো না
তোমার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে
যদি পারো তাদের বলে যেয়ো
অবিশ্বাসের প্রলয় সাগরে আমরা তলিয়ে গেলাম।
তোমরা ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করে নিও
একটি নোয়ার জলযান
চেয়ে নিও নোতুন সৃষ্টির বীজ
বিশ্বাসের বটপত্রে মুড়ে তাদের লুকিয়ে রেখো
আগলে রেখো বুকের তলায়
নূতন সূর্য্য যদি ওঠে তাকে ছড়িয়ে দিয়ো
নূতন জেগে ওঠা পলিমাটির চরে
আমাদের অভিশাপকে ধন্য কোরো
সেই নূতন আলোর আশীর্বাদে।

সঙ্গীত-সাধক স্বামী সত্যানন্দ

স্বামী নীলানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের অমর জীবন ছিল জীবনের বহুমুখী সাধনায় বিস্তৃত। ধর্ম-সাধনা, শিক্ষা-চর্চা, আচার্য-গিরি, আশ্রম-পরিচালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত রচনাও অঙ্গীভূত ছিল। তাঁর কণ্ঠও খুব সুমিষ্ট ছিল। মন্দিরে আরতির সময় তিনি হারমোনিয়ামের সুরের সঙ্গে ভজন করতেন। ইদানীং তাঁর দেব-দুর্লভ কণ্ঠের দুখানি গ্রামোফোন রেকর্ডও করা হয়েছে। এছাড়া আশ্রমের টেপ-রেকর্ডে তাঁর কণ্ঠের অনেক সঙ্গীত ধ্বনিবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর রচিত বাংলা ও হিন্দী ভজন-গুলি অধুনা আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে বহু শিল্পী প্রচার করে থাকেন। এছাড়া আশ্রম-পরিচালিত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং আশ্রমের নিত্য প্রার্থনা ও আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নিয়মিত গীত হয়ে থাকে।

অধুনা তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী (১৩৮৩) প্রকাশিত হয়েছে। রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত সংগীতগুলি সংকলিত হয়েছে।

সত্যানন্দ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর 'মঞ্জীর', 'বাঁশী ও অশ্রু,' 'বটের বাঁশী,' 'ব্রততী,' 'বটের বীণা (১ম),' 'বটের বীণা (২য়),' 'বটের বাউল,' 'বল্লরী,' পর্যায়ের গানগুলি গ্রথিত হয়েছে।

স্বামী সত্যানন্দদেবের প্রথম সংগীত গ্রন্থ 'মঞ্জীর'। এই পুস্তকটি সিউড়ীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাধনা' পর্যায়ের এই গানগুলির মধ্যে সাধকের অন্তরের ব্যাকুলতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নিজের মুখে শোনা—তখন তিনি নরসিংহপুরে নিরন্তর ধ্যানে রত। সেই সময় সাধকের মনে এল গানের কয়েকটি পদ কিন্তু লিখবার কোন মাধ্যম নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি মুখে বলে যেতে লাগলেন আর জনৈক ভক্ত কাঠ কয়লা দিয়ে লিখে নিলেন সাধকের জীবনের গভীরতম অনুভূতির অক্ষয় সম্পদ :

'অমা স্পন্দিত ঘন রাত্রি
চির চঞ্চল আমি যাত্রী
এই বিরহের তীরে।'

(মঞ্জীর। নং ১০১। পৃঃ ৫৪।)

বৈষ্ণব কাব্য ও সাধনার মূল সুর বিরহ। বৈষ্ণব সাধনায় ভক্ত কখনও মুক্তি চায় না। সে চায় ভগবানের সঙ্গে অনন্ত সান্নিধ্য। কিন্তু ভগবান লীলা করবার জন্য কখন কখনও অন্তর্হিত হয়ে ভক্তকে দুঃখও দেন এবং তার ভক্তির নিষ্ঠাও যাচাই করে নেন। ইষ্ট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য তাঁর অন্তরের আকুলতা তীব্র। কিন্তু ঠাকুর সাধককে পরীক্ষা করবার জন্য মাঝে মাঝে হন অধীর। এতে সাধকের বুকে বাজে ব্যথা। সাধক সত্যানন্দের সেই অন্তরের ব্যথা নিবেদিত হয়েছে তাঁর 'বাঁশী ও অশ্রু' সংগীত গ্রন্থে :

ব্যথা যদি দাও হে ঠাকুর সহিতে দিও বেদনা
যদি করুণ চরণ জড়ায়ে ধরি হে এড়ায়ে এড়ায়ে যেওনা।
স্মরণে চরণ দানিও মুরতি মধুর খানি ও
যদি বিদায় লইগো নয়নের জলে
থেকোনা অচেনা অজানা।'

(বাঁশী ও অশ্রু। নং ৫। পৃঃ ১০৭)

সাধক সত্যানন্দের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। জীবনের চরমতম অনুভূতি লাভ হয়েছে। তাঁর জীবনে অমারাত্রির অবসান ঘটেছে। তিনি সাধনার দ্বারা সত্যকে জেনেছেন। 'সত্য'-কে জানার আনন্দে তাঁর জীবন অমৃতান্বিত হয়েছে। তাঁর সেই আনন্দানুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছে 'বটের বাঁশী' সংগীত গ্রন্থে :

'চির জ্যোতির জ্যোতি তুমি—তুমি চির সুন্দর
জীবনের গতি দিলে তুমি চির ভাস্কর।

নব নবের ছন্দে বন্দনা জাগালে
বিশ্ব ভেউলে নব নব রঙে রাঙালে
আত্মার আত্মীয় প্রিয় হতে প্রিয়তরা।'

(বটের বাঁশী। নং ১৩। পৃঃ ১৫১।

ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে সর্ব্ব অভিমান, অহংকার শূন্য হতে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে বলেছেন :

'তৃনাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।'

অর্থাৎ ভক্তকে তৃণ হতে ক্ষুদ্র হয়ে, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু, অমানী ব্যক্তিকে মান দিয়ে এবং অভিমান বিসর্জন দিয়ে সদা হরিনাম কীর্ত্তন করতে হবে। এই অভিমান শূন্যতা, অহংকার বর্জ্জনের প্রকাশ দেখি তাঁর 'ব্রততী' সংগীত পুস্তকে :

'তোমার চরণ ধূলার তলে
আমি লুটাবে রহিব নয়ন জলে।'

মরমী কবির বেদনার মূর্চ্ছনা করুণ হয় পরমপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে :

'করুণ শেফালীর ব্যথা যদি মুছে দেয় নীরবতা
তবে বুকে তুলিও বারেক ছলে।'

(ব্রততী। নং ১০। পৃঃ ২০৪)

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব আজ নশ্বর দেহে আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু অগণিত ভক্তের চিত্তে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

বিজয়া

(গান)

[মিশ্র লঘুগুরু ছন্দ—চতুর্মাত্রিক]

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

হে আমার চিরসাথী,
পারী অপারে।
জ্বালো ধ্রুবতারা
দুফান-পাথারে।

তুমি বিনা কে দেখাবে
দিশা এ-আঁধারে?
ঐ বধূ বাঁশি আহা
বাজে ঝঙ্কারে :

"নাই ভয়, চলা তুই
গান গাহিয়া রে
কালো কাঁটা হবে ফুল
আলো-অভিসারে"।

"যে চায় শরণাগত
অন্তরে তারে
পরাজয়ে লভে জয়
যদি ঝুঁজিবারে।"

বয়স্কদের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও লাইব্রেরী

শ্রীঅমলেশ মিত্র

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় Manifestation of perfection-এর কথা বলে Education সম্বন্ধে কোন absolute সত্যের তথ্য পরিবেশন করতে যাচ্ছি না এই নিবন্ধে। আপাতত সেই সাধারণ স্তরের শিক্ষার কথা বলছি যা মানুষের বাস্তব বুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে ও বস্তু জগতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সহায়তা করে।

অশিক্ষিত মন বাঁচাই করতে জানেনা ; বুঝতে পারেনা বহু নষ্ট বস্তুকেও। যা বোঝে ভুল বোঝে। ফলে জীবন পথে চলার পদ্ধতিটাও তার যথার্থ বাস্তবানুগ হয়না। অতএব বহু পুরাতন কথা হলেও প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে বলতেই হচ্ছে যে, শিক্ষা, সমাজের সকলকেই পেতে হবে।

সমাজের কিছু লোক শিক্ষা পেলেই কাজ চলে যায়, এমন কথা আজ আর বলা চলে না। কারণ একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, সমাজের অধিকাংশ লোকই যদি বেতালা পা ফেলে চলে তবে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় না। দেখা দেয় নানা সমস্যা, নানা বিপত্তি। একথা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

অশিক্ষিত লোক না বুঝে অপরের উপদেশে কাজ করে গেলেও বহু কাজ চলে যায়, এমন মত আজও হয়তো অনেকে পোষণ করেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, যে কর্মী তার কাজের অর্থই বোঝেনা, কাজের উৎসাহ আশা করাও তাঁর কাছ থেকে অসম্ভব। তাই তার দ্বারা কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার আশাও কম।

ওদিকে অশিক্ষিত কর্মীর বুদ্ধির সহায়তা না পেয়ে উপদেশকারী তাঁর নিজের একার কাঁধে অনেক দায়িত্বের বোঝা বহন করতে বাধ্য হন। ফলে তাঁর ঝুঁকি অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। এই কথা প্রশাসন বিজ্ঞান (Administration Science) নানা ভাবে বার বার উচ্চারণ করেছে।

যাই হোক, সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার প্রচেষ্টায় সব দেশের মত এ দেশেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং হচ্ছে। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী হলেও ব্যাপক দারিদ্র্য ও অন্যান্য নানা কারণে সকলের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করা যেমন সে যুগে সম্ভব ছিল না তেমনই এ যুগেও সম্ভব হচ্ছে না। অথচ স্বাধীন ভারতে সকলেই চাইছেন যেন সমাজের প্রতিটি লোক অন্তত কিছু জীবনমুখী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা পান।

যারা বয়সে ছোট তাদের জন্য একটা বিশেষ বয়ঃসীমা পর্যন্ত আইনের সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। তাদের জন্য প্রাথমিক ও পরিবর্দ্ধিত প্রাথমিক স্তরের আরও বিদ্যালয় স্থাপন করাও হয়তো অসম্ভব হবে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে দেশের বয়স্ক অশিক্ষিতদের নিয়ে। তাঁদের নিয়ে সমস্যা প্রধানত দুই রকমের। প্রথম সমস্যা হল যে, যেহেতু তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই কোন না কোন অর্থ উপার্জন কার্যে নিযুক্ত, সে হেতু তাঁদের শিক্ষা-গ্রহণের জন্য বাড়তি সময় বিশেষ নাই বললেই চলে। আর দ্বিতীয় সমস্যা হল যে, তাঁরা সংখ্যায় এতই বিপুল যে, তাঁদের সকলকে না হোক বেশির ভাগকেও স্থান দেবার মত বিরাট সংখ্যক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের দরিদ্র সমাজ অপারক।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষাগ্রহণকারীদের সময়াভাব ও তাঁদের সংখ্যা বহুলতাজনিত সমস্যা দুটির আশু ও বাস্তবোপযোগী সমাধান না হলে বয়স্কদের শিক্ষাদান সম্ভবপর হচ্ছে না।

যাইহোক নানা চিন্তার পর এইটুকুই মনে হয় যে, প্রথম সমস্যা সমাধান করে অবসরকালীন ও সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম প্রচলন করা প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে সরকার নির্ভর না হয়ে বেসরকারী লোক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও বিশেষ করে লাইব্রেরীগুলিকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে এসে বয়স্ক শিক্ষা সম্প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

"বিশেষ করে লাইব্রেরী", এই কথা বলার যাথার্থ এই যে, আজকে আমরা সবাই তো জেনেছি যে, লাইব্রেরী কথার আধুনিক তাৎপর্য হল শিক্ষাগার বা অধ্যয়নাগার। লাইব্রেরী শুধু মাত্র গ্রন্থাগার নয়। গ্রন্থ তো বই-এর দোকানেও পাওয়া যায়। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বেই দার্শনিক Melvil Dewey বলেছিলেন "A library is a School and the librarian in the highest sense a teacher". পাশ্চাত্য ভাবনার শতাধিক বৎসরের পুরাতন কথাটির সঙ্গে আমরা কিছুদিন হল পরিচিত হয়েছি; আর বাস্তব ব্যবহারে তার যাথার্থ প্রতিষ্ঠা করার সময়ও হয়ে গেছে। তাই বিশেষভাবে লাইব্রেরীগুলিকে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হতে হবে।

এ ছাড়া আজকের ভাবনায় যখন বই হচ্ছে "Container of racial memory" বা গোষ্ঠী স্মৃতির ধারক ঠিক তখনই Pierce Butler সাহেব বলছেন "Library is one social apparatus for transferring this (racial memory) to the consciousness of the individuals" অর্থাৎ কিনা শুধু মাত্র বই-এর সঞ্চালাই (circulation) নয়, বই-এর মূলতত্ত্বের সংবাদ পরিবেশনও লাইব্রেরীর কাজ। আরো সহজ করে বলতে হয়, শিক্ষাদান লাইব্রেরীর একটি কাজ।

যাই হোক লাইব্রেরীগুলি কি ভাবে বয়স্কশিক্ষার ভার নেবে তা বলার আগে অবসরকালিন সংক্ষিপ্ত বা চুম্বকিত শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

শিক্ষা শুরুর কথা বলতেই সাধারণত আমরা বুঝি অক্ষর পরিচয় থেকে আরম্ভ করা। কারণ, আমাদের দেশের কিম্বা সব দেশেরই লোকের ধারণায় শিক্ষা ও সাক্ষরতা শব্দ দুটি এত ঘনিষ্টভাবে মিশে আছে যে ঐ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ঐ রকম ধারণা অনুসারেই শিক্ষিতের হারের সরকারী পরিসংখ্যান প্রস্তুত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র সামান্য পড়তে ও নাম সই করতে পারলেই তাকে সরকারীভাবে শিক্ষিত বলে ধরা হয়। অথচ লিখতে পড়তে না জেনেও যিনি নানা বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তাঁকে শিক্ষিত বলে মনে করতে আমরা শিখিনি।

এইভাবে, শিক্ষা ও সাক্ষরতা শব্দ দুটিকে সমার্থক ধারণা করার ফলেই শিক্ষা কথাটির সঙ্গে বই বা লিখিত বস্তুর (written material) ভাবনা স্বতঃপ্রোত ভাবে মিশে গেছে আমাদের মনে।

এ কথা সত্য যে, শিক্ষালাভের একটি সুবিধাজনক উপায় হল বই পড়া। কিন্তু তাই বলে বই বা লিখিত বিষয়ই যে শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র মাধ্যম এ কথা আজকের ইতিহাস ও বিজ্ঞান সচেতন যুগে বলা যাচ্ছে না। ইতিহাস বলছে যে, প্রাক বর্ণমালা যুগে মানুষ ছবি দিয়ে বুঝত এবং বোঝাত। ইতিহাস আরও প্রমাণ করছে যে, শুধুমাত্র শ্রবণ ও স্মরণের দ্বারাই (অর্থাৎ অক্ষরের সাহায্য ছাড়াই) ভারতীয়েরা স্মৃতি ও শ্রুতির যুগ থেকে নানা শাস্ত্র, পুরাণ ও মহাকাব্যের দার্শনিকতা ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা করে এসেছে। আবার আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান রেডিও ও টেলিভিশান ইত্যাদির মাধ্যমে লিখতে পড়তে না জানা লোককেও শিক্ষা দেওয়া যায়।

অতএব না পড়তে পারলেও জীবনে শিক্ষালাভ যে অবশ্যই সম্ভব এ কথা আরো উদাহরণ দিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন।

হয়তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নানা লোকশিক্ষার মধ্যে এ কথাও আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি নিজে নিরক্ষর থেকে দুরূহ সমস্ত শাস্ত্র তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের একজন ব্যক্তিগত সচিব (Private Secretary স্বনামধন্য সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মশায়ের নিজের মুখ থেকে শোনা গল্পটি একবার স্মরণ করলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গল্পটি এইরকম—সুধাকান্ত বাবু বাল্যে লেখা-পড়ায় খুব অমনোযোগী ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে প্রত্যহ যাতায়াত করেও পড়াশোনায় সুবিধা করতে পারলেন না। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ বালক সুধাকান্তকে নিজের কাছে কাছে রাখতে লাগলেন। ফলে কিছুদিন পরে ঐ সুধাকান্তই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিজ্ঞজনেদের কথাবার্তা শুনে শুনে নানা বিষয়ে বেশ জ্ঞান লাভ করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ তা দেখে কৌতুক করে ও স্নেহ ভরে সুধাকান্তের নাম দিলেন "সুধাকান্ত, পি এন. পি. পি" (The N.P.P.)। অর্থাৎ কিনা সুধাকান্ত, না পড়ে পণ্ডিত।

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মশায় অবশ্য অক্ষরজ্ঞান বর্জিত লোক মোটেই ছিলেন না। আসলে তিনি নিজের বাল্যকালের গল্পটি বলে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নিজে না পড়েও শেখা যায়। জ্ঞানী গুণীদের কথা মনে যথার্থভাবে অধিগ্রহণ করতে পারলেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুত নিজে অতি-পড়ুয়া না হয়েও শুধুমাত্র রবীন্দ্র সান্নিধ্যেই সুধাকান্ত পরবর্তীকালে বিখ্যাত ঋষি পণ্ডিত ও যথার্থ জীবন রসিক হতে পেরেছিলেন। অবশ্য সব অক্ষরজ্ঞান বর্জিত লোকেরাই সুধাকান্ত পণ্ডিত হয়ে উঠতে না পারলেও জগতে সাধারণভাবে চলার মত শিক্ষা অর্জন তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারবেন এবং তা পারবেন লিখন-পঠনহীন শিক্ষাতেও। অতএব অক্ষর বর্জিত শিক্ষাক্রম প্রচলন বয়স্ক শিক্ষা সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই গ্রহণীয়।

আসলে পাঠক্রম লোকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই যে, তিনি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই নিজে পড়ে অনেক কিছু শিখতে পারেন। আবার প্রয়োজন বোধে একই বিষয়বস্তু একাধিকবার পড়বার সুযোগও তিনি পান।

অক্ষর বর্জিত (লিখন-পঠনহীন) শিক্ষায় উপরোক্ত সুবিধাগুলি না থাকলেও একথা বলতে হয় যে, বয়স্কদের শিক্ষাদানের মত একটা জটিল ব্যাপার বা পুরাতন জীর্ণ গৃহকে অপেক্ষাকৃত নূতনরূপের দ্বারা বাসোপযোগী করে তোলার সমতুল্য, তাকে রূপ দিতে গিয়ে একেবারে ভিত্তি থেকে ও বিশদভাবে তা করতে যাওয়া অনাবশ্যক ও অসম্ভব।

যদি নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা দিতে গিয়ে একেবারে অক্ষর পরিচয়ের দিনটি থেকে শুরু করা যায় ও পর্যায়ক্রমে গতানুগতিক ভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় তা হলে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই একেবারে এক্ষুনি না হোক অন্তত বার্ধক্যের দিন সমাগত হবে, সন্দেহ নাই। কারণ Adult education সম্বন্ধে এক সরকারী ইস্তাহারে (National Adult Education Programme : an outline 1978—Ministry of education, Govt. of India) বলা হয়েছে যে ৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অশিক্ষিত লোকেদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ দিতে হবে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষালয়ে যে শিক্ষাক্রম দশবৎসরে শেষ হয় তা বয়স্কদের ক্ষেত্রে কুড়ি বৎসরের বেশিও লাগতে পারে। কারণ নানা বৈষয়ীক নিত্যকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা যে সামান্য সময় শিক্ষাগ্রহণের জন্যে দিতে পারবেন তাতে ব্যাপারটি ঐরকমই দাঁড়ায়। অতএব পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে ঐ শিক্ষা তাঁদের জীবনে অর্জিত হলেও তা কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগবেনা।

তাই লিখতে পড়তে শেখানর জন্য সময় ব্যয় না করে বিকল্প পন্থা হিসাবে বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং পূর্বোক্ত Audio-visual aid এর সাহায্যে শিক্ষাদানই বয়স্ক অশিক্ষিতদের ক্ষেত্রে প্রশস্ত। আর এই শিক্ষা হবে যথাসম্ভব চুম্বকিত।

দেশের ইতিহাস, দেশের প্রশাসনিক গঠনতন্ত্র, পৃথিবীর আকার, বাস্তুতন্ত্র, পৌর কর্তব্য ও অধিকার কিম্বা বিদ্যুৎ শক্তি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রভৃতি ব্যবহারিক জ্ঞান শাখাগুলি নিয়ে যাই শিক্ষা দেওয়া যাক তাই হবে সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের।

হাতের কাজ Work education। যদি তাদের শেখাতেই হয় তাহলে তাঁরা যে সমস্ত কাজে ব্যক্তিগত

ভাবে নিযুক্ত ও অভ্যস্ত শুধু তাকেই উন্নততর করার জন্য হাতের কাজ শেখান যেতে পারে। নচেৎ নতুন কোন হাতের কাজ শিক্ষা তাদের পক্ষে অনাবশ্যক ভার স্বরূপ হবে।

দর্শন, সাহিত্য, চারুশিল্প প্রভৃতি অবৈষয়ীক ও ভাব প্রধান বিষয়ের শিক্ষা, শিক্ষা গ্রহণকারীদের সংক্ষিপ্ত সময়ের কারণে এই শিক্ষাক্রমে পরিহার্য্য মনে করলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

এই তো গেল শিক্ষণীয় বিষয়ের বা শিক্ষাক্রমের কথা। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক। সরকারী হিসাবে প্রায় ১০ কোটি। লোকেদের শিক্ষালয় কোথায় হতে পারে, কারা তাঁদের শিক্ষা দেবেন, আর কেই বা এই বৃহৎ যজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করবেন তা চিন্তার বিষয়।

সরকার অবশ্য স্থানীয় স্কুলগুলিতে নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে স্বল্প বেতনে শিক্ষক নিযুক্তির ব্যয় বহন করতে সচেষ্ট হতে পারেন। তাতে স্থানীয় শিক্ষিত বেকারদের সামান্য উপার্জনের একটা রাস্তাও হয়ে যাবে।

কিন্তু সরকারী ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে স্থানীয় গ্রন্থাগারিকেরা অগ্রবর্ত্তী হয়ে ঐ বিষয়ে কিছু করতে পারেন কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির এ বিষয়ে কতখানি করা উচিত, ইত্যাদি সমালোচনায় না গিয়ে যদি লাইব্রেরীয়ানেরা "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও" নীতি গ্রহণ করেন তাতে তাঁদের লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু নাই।

আমরা জানি যে জেলাগ্রন্থাগার ও গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির প্রায় বেশির ভাগই সাধারণ অফিস কাছারির মত বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভুক্ত গ্রন্থাগারগুলির মত মধ্যাহ্নকালে কাজ করেনা এবং খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তা করেনা। ঐ গ্রন্থাগারগুলি অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যাকালে খোলা থাকে ও কাজ করে। কাজেই দিবা ভাগে নানা কর্ত্তব্যরত বয়স্কদের জন্য অবসর-কালিন সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দেবার স্থান হিসাবে উক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে নির্বাচন করা চলে।

সেখানে গ্রামের কিছু শিক্ষিত লোক বয়স্কদের শিক্ষা দিতে পারেন। আর এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা হবে তত না শিক্ষকের তত শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠকের। কারণ, যেহেতু ঐ সময়টিই তাঁর অফিসের সময় সেইহেতু তাঁকে ঐ সময়টিতে নৈমিত্তিক কর্মধারায় নিযুক্ত থাকতে হয়। তাই শিক্ষকতা করার প্রাত্যহিক রুটিন অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক। অথচ সংগঠকের ভূমিকায় থাকলে তাঁর কাছ থেকে নানা সহায়তা পাওয়া যায় এবং তাঁর নিজস্ব ধারায় তাঁর প্রভাবকে কাজে লাগান যায়।

বয়স্কশিক্ষার সংগঠক হিসাবে লাইব্রেরীয়ান কমিটি তৈরী করবেন, কমিটির সভা আহ্বান করবেন, শিক্ষক সংগ্রহ করবেন এবং চাঁদা ইত্যাদির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। আবার প্রয়োজন হলে অথবা তাঁর আত্মতৃপ্তির জন্যে মাঝে মধ্যে শিক্ষকতাও করতে পারবেন।

বড় সহরে বয়স্ক শিক্ষার নানা অবসরকালিন ও নৈশ ব্যবস্থার তুলনায় সেখানে গ্রন্থাগারিকের এই ব্যাপারে ভূমিকাটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ না করতেও পারে; কিন্তু গ্রাম মফঃস্বলে উক্ত ব্যাপারে তাঁর সংগঠকত্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং প্রায় অপরিহার্য্য বিষয়। কারণ, ঐসব অঞ্চলে বয়স্কশিক্ষা সংগঠক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

আবার গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত ব্যক্তিদের অজ্ঞতার মাত্রা সহরাঞ্চলের অনুরূপ ব্যক্তিদের অজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশি। সহরের ঐ ব্যক্তিরা সেখানকার নানা বৈচিত্র্য দেখে ও নানাভাবে ঠেকে অনেক কিছুই শিক্ষালাভ করেন। সে ক্ষেত্রে গ্রাম, মফঃস্বলের গতানুগতিকতার দেখে ও ঠেকে শেখার সুযোগ বিশেষ নাই। তাই ঐ সব অঞ্চলে অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষাদান করে তাঁদিকে সমাজের আরো প্রয়োজনীয় অংশ করে তোলার কাজ অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আর ঐ গুরুদায়িত্ব যদি গ্রন্থাগারিকেরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেন তা হলে তাঁদের নিজেদের সামাজিক মর্য্যাদা ও অপরিহার্য্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আর সেই সঙ্গে প্রমাণিত হবে "A Librarian is in the highest sense a teacher."

ইমার্সনের কবিতা "ব্রহ্ম" ও স্বামী অভেদানন্দের ব্যাখ্যা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

রাল্ফ ওয়ালডো ইমার্সন আমেরিকার একজন বিখ্যাত কবি। তাঁর 'ব্রহ্ম' নামক কবিতাটি ইংরাজী ভাষায় এবং বিশ্বসাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে সমাদৃত। ইমার্সন ১৮০৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ খ্রীঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। আঠারো বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে পিতার বৃত্তিতেই বোস্টন শহরের প্যারিশে নিযুক্ত হন। তাঁর ধর্মভাবনা ব্যক্তিত্ব সচেতন হওয়ায়, ধর্মযাজকের কর্ম ত্যাগ করেন। তিনি বক্তা, লেখক, কবি, মনীষী হিসাবে দেশবিদেশে যশস্বী হয়ে উঠেন। ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে তিনি ইংরাজ কবি কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও দার্শনিক লেখক কারলাইলের সংস্পর্শে আসেন। কথোপকথনের সময় কারলাইল তাঁকে একটি ভগবত গীতার অনুবাদ দেখান। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস উলকিন্স অনূদিত ভাগবত গীতার ইংরাজী ভাষায় এই প্রথম অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইখানি তাঁর জীবনে সবচেয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেছে, স্বস্তি ও সান্ত্বনা এনেছে এবং ইমার্সনের জীবনেও তা ঘটবে বলে কারলাইল বইখানি তাঁকে পড়তে দেন। ইমার্সন গীতা পড়েন। উপনিষদগুলিও পরে পড়েন এবং তাঁর 'ব্রহ্ম' কবিতাটি তাঁর গীতা ও উপনিষদ পাঠপ্রসূত উপলব্ধি হতে লেখা। তিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্বরূপ নিয়ে Over-soul 'ওভার সোল' প্রবন্ধটি লেখেন এবং কঠোপনিষদের উপর নির্ভর করে 'Immortality' বা 'অমৃতত্ব' প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি Edwin Arnold অনূদিত কঠোপনিষদের অনুবাদ 'The Secret of Death' গ্রন্থটি ব্যবহার করেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন ইমার্সনের বাড়ী দেখতে যান, তখন তাঁর লাইব্রেরীতে ভগবত গীতা, উপনিষদ, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণও রক্ষিত দেখতে পান।

১৯২১ সালে ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরে স্বামী অভেদানন্দ ইমার্সনের 'ব্রহ্ম' কবিতাটির বিশদ ব্যাখ্যা করেন।[১] কবিতাটি নিম্নে দিলাম—

"If the red slayer think he slays
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass and turn again.

II

Far or forgot to me is near,
Shadow and sunlight are the same :
The vanished gods to me appear :
And one to me are shame and fame.

III

They reckon ill who leave me out ;
When me they fly, I am the wings ;
I am the doubter and the doubt
And I the hymn the Brahmin sings.

IV

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven,
But Thou, meek lover of the good !
Find me, and turn thy back on heaven.

প্রথম পঙ্‌ক্তিটি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ শ্লোকের ভাব গ্রহণ করে লেখা।

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।"

যে আত্মাকে হননকারী বলে মনে করে এবং উহাকে হত বলে মনে করে তারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না : ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না, কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লীর ১৮—১৯ শ্লোকেও এই কথা।

---

১ Complete Works of Swami Abhedananda, Vol. II Appendix I, p. 392

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে"

এই আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই। কোন কারণ হতে উদ্ভূত না, ইহা হতেও কিছু উৎপন্ন হয় না। ইহা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। শরীর নিহত হলেও তাঁর নাশ হয় না। হননকারী যদি মনে করে যে, আত্মাকে হত্যা করি বা হত ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি হত হয়েছি, তবে তারা উভয়েই অজ্ঞ। কেননা উক্ত আত্মা কাউকেও হত্যা করেন না, কিংবা নিজেও হত হন না।

প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষ দুই ছত্রে আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্মের কথা। গীতায় এই আত্মার পৃথিবীতে গতায়াতির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোকে আছে।

'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।'

ঐ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে আছে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

জীবের এই দেহে যেমন বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাতে মোহগ্রস্ত হন না। যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন শরীর পরিগ্রহণ করে।

ইমারসনের Immortalityর উপর যে প্রবন্ধটি আছে তাতে এই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ হতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ২০ শ্লোকে আছে—'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্'—Subtler than what is subtle, greater than what is great. সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হতে বিশালতর। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২—১৪ শ্লোকে ৫ই ব্রহ্মের, পরমব্রহ্মের বর্ণনা আছে—

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥"

যা জ্ঞাতব্য, যা জ্ঞাত হলে অমৃত বা মোক্ষ লাভ হয় তা বলছি, তা আদ্যন্তহীন, আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম, তৎ সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি সৎও নন, অসৎও নন। সর্বদিকে তাঁর হস্তপদ, সর্বদিকে তাঁর চক্ষু, মস্তক ও মুখ। সর্বদিকে তাঁর কর্ণ; এইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপি তিনি অবস্থিত আছেন। তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান; তিনি সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত নিঃসঙ্গ, সকল বস্তুর আধার স্বরূপ, নির্গুণ এবং সকল গুণের ভোক্তা। সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে তিনি, চল এবং অচলও তিনি, সূক্ষ্মতা বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় এবং তিনি দূরে অবস্থিত, নিকটেও স্থিত।

এখান হতেই ইমারসন তাঁর কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম সারিটি পেয়েছেন—far or forgot to me is near.

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় সারিটি 'Shadow and sunlight are the same', কঠোপনিষদ হতে পাওয়া। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লীর প্রথম শ্লোক -

'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥'

নিজ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী যে দুইজন পুরুষ এই লোকে উক্ত পরমব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান গুহার বা বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট আছেন, তাঁদিকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ এবং অপর যাঁরা পঞ্চাগ্নিক

বা জিলাচিকেত তাঁরাও আলোক ও ছায়ার ন্যায় বলে থাকেন। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে এই শশি সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিতির কথা—প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।

ইমার্সনের কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ দুই ছত্রে ঐক্যের কথা, সাম্যের কথা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৮—১৯ শ্লোকে এই সমত্ববুদ্ধির কথা।

'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥'

যিনি শত্রু মিত্রে, মান অপমানে, শীতউষ্ণে, সুখদুঃখে সমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন, যিনি সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিবর্জিত, স্তুতি বা নিন্দাতে যাঁর তুল্য জ্ঞান, যিনি সংযতবাক, যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট, গৃহাদি মমত্ব বুদ্ধি বিবর্জিত এবং স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়।

কবিতার তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই ছত্রে বলা হচ্ছে যে ব্রহ্মকে কর্ত্তা না ভেবে যে নিজেকে কর্ত্তা ভাবে, সে ব্রহ্ম থেকে সরে যাচ্ছে, ত্যাগ করছে। কিন্তু এই সরে যাওয়াও ব্রহ্ম। তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার উপায় নাই। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকে চমৎকার ভাবে এই কথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলিতে কিছুই নাই।

তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ দুই ছত্রে বলা হলো যে ব্রহ্মই বিষয়, বিষয়ী ও সম্বন্ধ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। একের মধ্যেই প্রিয়, প্রেমিক ও প্রেম। ব্রহ্মই সর্বভূতাত্মা। ইমার্সন পরমাত্মন বলতে এই ব্রহ্মই বুঝেছিলেন। তাঁর 'Oversoul' প্রবন্ধে লেখেন "দর্শন ও দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, বিষয়ী ও বিষয় সব এক।" গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে আছে—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥"

সর্পণ ব্রহ্ম, হুতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন। কার্য্য, কারক ও কার্য্য ফল সবই এক, প্রকাশ বিভিন্ন। চিন্তা চিন্তনের ফল, চিন্তা শক্তি ও আত্মার সচেতন কর্ম্ম। 'আমিই সন্দেহ ও সন্দেহকারী' এখানেও সেই একের, পরমাত্মনের স্বরূপের ইঙ্গিত, সকল বৈপরীত্যের সমন্বয় ও অবসান। ইমার্সন বিশ্বাস করতেন যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট। প্রত্যেক জীবাত্মাই একটি দেবস্থান, ব্রহ্মণের বা পরমাত্মার গৃহ বা মন্দির।

শেষ লাইনে রয়েছে 'I am the hymn that Brahmin sings এই ভাবটি গীতার দশম অধ্যায়ের ২২নং শ্লোকের দ্বারা প্রভাবিত। "বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" মন্ত্রের মধ্য দিয়ে জ্ঞান উদ্ভাসিত হতো তাই ঋক বেদ নাম। সুর সংযোগে যখন সেগুলি গীত হতো, তখন তাদিকে সামবেদ বলা হতো।

এর পরেই কবিতার চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে পুরুষোত্তমের স্বরূপ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়।

The strong gods pine for my abode
And pine in vain the sacred Seven.

বলা হলো বেদস্তুত দেবগণেরও আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম সুদুর্লভ এবং সপ্তর্ষিরাও আমাকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। গীতার দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান বললেন

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥"

কি দেবগণ, কি মহর্ষিগণ, কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিষয় জ্ঞাত নহেন। কেননা আমি দেব ও মহর্ষিগণের সর্ব্ব প্রকারেই আদি কারণ।

একাদশ অধ্যায় ৫২ শ্লোকে পরিষ্কার করে ভগবান বললেন,

"দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।"

দেবগণও সর্ব্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। পরের শ্লোকেই পাওয়া গেল।

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥"

আমাকে যে রূপে দেখলে, এই রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা দান, যজ্ঞ কোন কিছুর দ্বারাই দর্শন করা যায় না। কিরূপে দেখা যায়, পরের শ্লোকেই তার বর্ণনা—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই, হে অর্জুন, হে পরন্তপ, ঈদৃশ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দেখতে পারা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করতে পারা যায়। প্রেম ও ভক্তির পথই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট পথ ইমার্সন এই কথাই তাঁর "Immortality" প্রবন্ধে বলেন—

"The soul cannot be gained by knowledge nor by manifold services. It can be obtained by the soul, by which it is desired. It reveals its own truth."

"Desire" মানে আকাঙ্ক্ষা করা এটা 'যে ভালবাসে' তাই বলাই ভাল।

কবিতার চতুর্থ পঙ্‌ক্তির শেষ দুই ছত্রে ইমার্সন বললেন, দেবগণ, ঋষিগণ পান না কিন্তু যে দীনভাবে সবকে ভালবাসে সে আমাকে পায়, ব্রহ্মকে পায় এবং স্বর্গের দিকে ফিরেও তাকায় না।

বারে বারে গীতায় এই কথা বলা হয়েছে।

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ"॥

—"মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।"

ইমার্সন গীতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং পাপপুণ্য স্বর্গকামনাদির ঊর্দ্ধে ব্রহ্মোপলব্ধির ও ভগবৎভক্তির কথা কাব্যে রূপায়িত করেন। ইমার্সন এক ব্রহ্ম, এক সত্তা, এক পরমাত্মায় বিশ্বাস করেন। ঋক্ বেদে আছে "একম্ সদ্‌বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' বেদান্তের কথাই ইমার্সন 'ব্রহ্ম' কবিতাটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করে স্বামী অভেদানন্দ কবিতাটির ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মূল বিশ্লেষণটিই সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করেছি।

বালক প্রভু

সুরেন্দু মল্লিক

শুধু একটি শুভ্র মেঘ পৃথিবী ও আকাশের ঠিক
মাঝখানে থেমে আছে।
ঠিক মাঝখানে।
তোমার পায়ের চিহ্ন ভেজা ঘাসে, উত্তপ্ত সোপানে।
কিভাবে আরম্ভ হলো আবার কোথায় হবে শেষ
আলোর উদ্বিগ্ন শিখা কাঁপায় নিমেষ।

সুমঙ্গল দুরাশার জ্যোৎস্নায় খৃষ্টাব্দের সমাধির মতো
অপেক্ষা করেছি আমি তন্দ্রায় জাগ্রত।
কুয়াশার স্নান ভুলে আবিষ্ট মর্মর
নিঃশব্দ ধ্বনিতে বাজে বালক প্রভুর কণ্ঠস্বর।

॥ গান ॥

শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী

এবার আমার সাঙ্গ হ'ল সকল চাওয়া পাওয়ার গান
তোমার দেশে যাবার লগ্ন তাই যে আকুল এমন প্রাণ,
এই সংসার দুঃসহ ভার
শেষ নাই তো যন্ত্রণা আর
জরা-ব্যাধি-পঙ্গু ভার কর ঠাকুর অবসান।

প্রাজ্ঞ গুণী অহঙ্কারে কীর্তি যশ মহীমায়
লক্ষকীর্ত আত্ম-প্রাধায় লিপ্ত জীবন কালিমায়
থাকতে সময় চৈতন্যোদয়
হয়নি তোমার পরিচয়
শূন্য বুক শূন্য সকল ভগ্ন তরী ভাসমান।

নীলমাধবের টানে

যোগদাপুরী

বিজন মধ্যাহ্ন, কান পেতে শোনে একটা ঝড়ের ব্যাকুল ধ্বনি। আমরা বোতলার ঘরে কেউ বসে, কেউ অর্দ্ধ শায়িত হয়ে বলি. দেখ নিস্তব্ধ প্রহরে সমুদ্রের ঢেউ ঠিক ঝড়ের শব্দের মত শোনা যাচ্ছে। শোভামা বল্লেন, হ্যাঁ শ্রীমা পুরীতে এসে এই ঢেউ শুনে বলেছিলেন, ও কাঁদবেনি ওর বুক থেকে তো মাণিককে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।' এই বলে শোভামা সেই সমুদ্র মন্থনের কথাটি বল্লেন। সতীমা, গীতাদি, আমি বলি সে তো অনেক দিনের কথা, জননী সারদা নিজেই লক্ষ্মী কাজেই তাঁর বেদনা বুঝেই বলেছিলেন। তবে সাগরকে লক্ষ্মী বলে তার গর্ভে অনেক রত্ন ভাণ্ডার আছে দেখে। তাই পূজাও করে। রুটি কিন্তু নীল নারায়ণের মত তাঁরা তো একই কাজেই যার যেমন মনে হয়। কথায় কথায় দেখি বিকেলের ছায়া নেমে আসে, সতীমা, চিতু বলে আসুন মা আপনারা বাইরে কি সুন্দর আকাশের রং খুলেছে। রেলিং দেওয়া উপরের বারাণ্ডায় এসে দেখি, আকাশের রূপ বাহার: সমুদ্রও যেন শান্ত। সতীমা বল্লেন, মেঘের ঐ সোনালী পথটা দিয়ে মনে হচ্ছে ঠাকুরের কাছে চলে যাই। আমি বলি, একছড়া মালা যেন ঐ পথের মাঝে পড়ে আছে। হয় তো যাবার পথে তুলে নেবেন যোগীরাজ। গীতাদি বল্লো, গৈরিক উত্তরী গায়ে দিয়ে এবার যেন ফিরছেন আপন আলয়ে এই বলে আমি বললাম দেখ, সূর্য্যের লাল রংটা যেন আকাশ জুড়ে হোলী খেলেছে। সেই রংলাটিও পড়েছেন। এই বলে সকলে মিলে হাসি আনন্দ করা গেল।

এমন সময় মনোরঞ্জন বাবু (ঘোষ মহারাজ) ডাক দিলেন শঙ্কর আচার্য্যের মন্দিরে যাবার জন্যে। তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। তখনও সমুদ্রের জলে চান করছে পুরীর দু একটা যাত্রী। আমাদের বাড়ীর সংলগ্নেই একটি মন্দির সেখান থেকেও দু একটি হিপি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চান করছে, গীতাদি, চিতু, আমি বলি হিপিগুলোর মজা দেখ তখন থেকে সমুদ্রে জলে ডাবের ঘোলার মত ভাসছে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে তো খেয়াল নাই। এদিকে অরুণদা, আনন্দদা তাড়াতাড়ি ডাক দিলেন আমরা সকলে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

সমুদ্রের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ হাওয়ায় মনটা জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ফুলের কেয়ারী সাজানো বাড়ীগুলি পেরিয়ে এগিয়ে এল ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। বিস্তৃত বড় সোপানগুলি পারিয়ে ঘোষ মহারাজ আনন্দদা জল নিয়ে এলেন পাণ্ডারা বলে যায় ঐতিহাসিক কাহিনী। এই জল বুঝি মাথায় স্পর্শ করতে হয়। সকলে সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী করে এলাম লোকনাথ শিব দর্শন করতে।

বাঁধানো একটি জায়গা। বিরাট বট বৃক্ষের পাশ দিয়ে পেরিয়ে এসে নামলাম বিস্তৃত চত্বরে। দু-পাশে দীন নারায়ণদের সারি। একটি পুকুরিণীতে প্রচুর মাছ খেলা করছে নানা রংয়ের। কাছেই মুড়ি ছোলা বিক্রি হচ্ছে। আমরা কয়েকটি প্যাকেট কিনে নিয়ে জলে ছোলা ছড়িয়ে দিলাম মাছগুলিকে। কিছুদূর এগিয়ে এসে ফুল মালা কিনলাম। ছোট মন্দিরে ঢুকে শিবপূজা করে এলাম।

আমাদের গাড়ী দ্রুত এগিয়ে চলেছে শঙ্কর আচার্য্যের মন্দিরের দিকে। এর মাঝে একটি গাড়ী খারাপ হয়ে গেল। একটি গাড়ীতে সকলে আমরা ভীড় করে চাপলাম। এর মাঝে সুরু হোল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। শচীমা ঘোষ মহারাজ বলেন আমরা রিক্সা করে যাই ড্রাইভার বলে আর আমরা মন্দিরের পথে এগিয়ে এসেছি।

তাকিয়ে দেখি গাছের ছায়া নেমে এসেছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে পরিষ্কার আকাশে জল জল করছে নক্ষত্রমালা। যেন বেদোজ্জ্বল শিখায় মহান আলোকে অভিভূত হয়ে আছে। গাড়ী থামলো শঙ্কর আচার্য্যের মন্দির সামনে। পাহাড়ের

উঁচু সিঁড়িগুলি দিয়ে নীচে নামলাম। ঠিক মনে হচ্ছিল পাহাড়ের নীচে যেন মন্দির। সামনের শিবলিঙ্গ। ছোট্ট নাট-মন্দির পেরিয়ে শঙ্কর আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দির। কতকগুলি বালক ঝাঁসর ঘন্টা বাজাতে সুরু করলো, একজন তাদেরই মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে নৃত্যছন্দে ঘন্টা বাজিয়ে আরতি সুরু করলো। আমরা দাঁড়িয়ে দেখি বেশ ভালো লাগলো। সমস্তমন্দিরে মন্দিরে প্রদীপ হাতে আরতি করে এল নাটমন্দিরে একদিকে বাঁধানো হোমকুণ্ড শঙ্কর আচার্য্যের সিংহ আসন সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি সমস্ত জায়গায় আরতি করে মন্দিরে প্রদীপ নামিয়ে রাখলো : শুরু হোল বালকদের অধ্যয়ন। আমরা সব জায়গায় প্রণামী দিলাম। ছোটদের পুস্তকের জন্যেও কিছু টাকা দিয়ে এলাম। এটি শঙ্কর আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠ। প্রধান সিংহ পদ্মপাদকে শঙ্কর আচার্য্য মঠাধ্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। সারা আশ্রম ভূমিতে যেন বেদোজ্জ্বল প্রসন্ন আলোক বিরাজ করছে। আমরা বেশ কিছুক্ষণ বসে ধ্যান করে ফিরে এলাম নিজেদের আলয়ে।

ভোরের আলোছায়া বেলায় দেখি পূবালী আকাশ হেসে উঠেছে। একদিকে সুরু হয়েছে সমুদ্রের জলদ গম্ভীর সুর। সকলে আমরা সেদিন তৈরী হয়েনি সাক্ষী গোপাল দর্শনের জন্যে। এদিকে ঘোষ মহারাজের অর্ডার মত দুটা গাড়ীও এসে হাজির। ঠাকুরের মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে সুরু হোল জয়যাত্রা। সহরের রাস্তা পেরিয়ে গ্রাম। অনাবিল ছবি। পল্লীলক্ষ্মীর স্নেহে মাঠ ঘাট প্রান্তরে একটা মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। সবুজ সোনালী ধানের ক্ষেত। কাজল কালো দিঘীতে কৌমুদী হাসে। কোথাও নদীর জলরেখা, কোথাও তাল তমাল বনান্তে সূর্য্যের রক্তিম আভা। অকস্মাৎ প্রভাতী বেলায় প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে মনে ঠাকুরের কবিতায় এই লাইনটী আছে কালীদাসের। "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা/আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে ধারা নিবদ্ধে কলঙ্করেখা।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সাক্ষী গোপালের মন্দির সামনে এসে পড়লাম। ছায়া ছায়া বনপথ পেরিয়ে মন্দিরে দ্বারে প্রবেশ করতেই পাণ্ডাদের উপদ্রব। স্থির হয়ে আমাদের পূজার নির্ম্মাল্য কিনতে দিচ্ছেনা। প্রথমেই একজন বিরাট খাতা নিয়ে বসলো একটী উঁচু দাওয়ায় আর বল্লো, এত টাকা প্রণামী দিন পূজার নাম গোত্র বলে, এই গোপালের ভোগ কিনে নিয়ে যান। শুধু গঙ্গায় পা ধুয়ে এত টাকা প্রণামী দিন। আমরা তো পূজা করতে গিয়ে হেসে সারা। পূজার খাতায় টাকা দিয়ে নাম গোত্র লিখে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। পাণ্ডারা তখনও ধাওয়া করে বলে ঐখানে রাধারাণী স্নান করেছিলেন জলস্পর্শ করতে হয়। একশো এক টাকা দাও, আমরা মন্দিরে এসে বাঁচি রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে পূজা সেরেনি। সুঠাম বিগ্রহমূর্ত্তি ভারী সুন্দর। কৃষ্ণজী মিষ্টি হাসি হেসে যেন সবার মন কেড়ে নিচ্ছেন রাধারাণী মালা পড়িয়ে দিচ্ছেন। নিভৃত ছায়ালীর গ্রামখানীর মাঝে সাক্ষী গোপাল মূর্ত্তি যেন সকলকে আকর্ষণ করছে। আমরা মন্দিরে কৃষ্ণজীকে মালা পরিয়ে প্রদীপ ধূপ দিয়ে চলে এলাম। সেখানে আমাদের একটী ছবি তোলা হোল। রৌদ্র আলোকিত বেলা। চারদিক একটু ঘুরে ফিরে দেখতেই তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়লাম। পাণ্ডাদের উপদ্রবের জন্যে পয়সা টাকাও দিলাম তবুও বলে যায় আরও দাও মা লক্ষ্মীরা অনেক ধন দৌলত হবে, সুখে শান্তিতে থাকবে। ঘোষ মহারাজ, অরুণদা তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়তে বলেন তখনও কয়েকটী পাণ্ডারা ও স্থানীয়রা বলে ওরে এরা খুব বড়লোক, মঠ থেকে এসেছে আরও পয়সা দাও তা নিয়ে গাড়ী উল্টে যাবে ইত্যাদি বলতে সুরু করেছে। আমরা কেউ পয়সা টাকা ছড়িয়ে দিলাম গাড়ী তখন চলতে সুরু করেছে স্পীড নিয়ে। এমন সময় একটা শব্দ করে গাড়ীটা থেমে গেল। একটা কুকুরের বিকট শব্দে। এদিকে আমরা হঠাৎ গাড়ীতে এর ওর গায়ে কি রকম টাল খেয়ে গড়িয়ে পেছি। গাড়ীটা থামার পর দেখা গেল কুকুরটা মরেনি। গাড়ী আবার দ্রুত এগিয়ে এল আমাদের পুরীর ভবনে। ফিরে এসে হাসির মাঝে ভেসে ওঠে সাক্ষী গোপালের অপরূপ মিলন মূর্ত্তিটী মনের মন্দিরে। (ক্রমশঃ)

মাতৃকৃপায়—মুক্তিতীর্থ—অমরনাথ

শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

অবাক হলাম পরের দিন অফিসে গিয়ে। আমার সহকর্মী, অকৃত্রিম বন্ধু, হিমালয় ভ্রমণের কর্ণধার, আমার নবদা বখন বেশ আদেশের সুরেই বল্লো—"চলো দাদা—অমরনাথ চলো। সাথে কিন্তু এবার মীরা বৌদিকেও নিতে হবে। কোন অজুহাত শুনবো না।" আমার কোন আপত্তির সুযোগও রইল না। যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। রাসপূর্ণিমার পরে—উৎসবের যাত্রীরা ভিড় এড়াবার জন্যেই।

যাত্রার দিন ঠিক হোল ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ শুক্রবার। পথের সাথীরূপে এলো সহকর্মী শ্রীপ্রবোধ ঘোষ, শ্রীশ্যামল রায়, শ্রীনবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার স্ত্রী শ্রীমতী মীরা গুপ্ত।

অমৃতসর হয়ে হাওড়া/জম্মু যাতায়াতের টিকিট কাটা হোল ৬খানা। হাওড়া টেশন। প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১০। গাড়ীর নাম ঃ আপ অর্থাৎ অমৃতসর মেইল। ছাড়ার সময় সন্ধ্যা ৬-৫৫ মিঃ। মাতৃপ্রণাম সেরে মায়ের আশীর্বাদ সম্বল করে সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ হাওড়া টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ছেলে মেয়েরা সবাই এলো টেশনে। মনটা বেশ খারাপ লাগছিল। আমরা দুজনে এক সাথে তাদের ফেলে কোথাও কোনদিন যাইনি। যদিও এখন সকলেই বেশ বড়ো হয়েছে দেহগতভাবে কিন্তু মনগতভাবে এখনও আমাদের চোখে ওদের কারোরই শৈশব কাটে নি। তাই চিন্তা। চিন্তা রুগ্না মায়ের জন্যেও। যাক—মনে মনে স্থির করে নিলাম যিনি সকল চিন্তার চিন্তামনী—আবার সকল চিন্তার আশ্রয়-স্থলও তো তিনিই। আমার সকল চিন্তার সমাধান তিনিই করবেন। বৃথা চিন্তা করে কষ্ট বাড়ানো ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। চিন্তাকে অঞ্জলি করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে সচেষ্ট হলাম। এতে চিন্তার পীড়ন কমলো বটে তবে উপস্থিতি রয়েই গেল।

মনের উপরে বড় অভিমান হলো। ভাবলাম যে, যেখানে সব কিছুই গত হয়ে যায় তার নামই তো জগৎ। এই জগতে যা কিছু ঘটে—সকলই তো পূর্ব নির্বাচিত নিয়তির অমোঘ বিধানে বিধিবদ্ধ। যা ঘটনা তা ঘটবেই। আমার সামনে কি তার আবির্ভাব কখনো নিষিদ্ধ হবে? না আমি সামনে থাকলে তার শুভাগমন রুদ্ধ হবে? অসহায় ভাবে নিয়তির নিয়মের কাছে সকলেই তো আত্মসমর্পনে বাধ্য। তাই যদি হয়—তবে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক বৃথা চিন্তার পরে শুভবুদ্ধি যোগে বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা করে বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।

বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা এলো শুভেচ্ছার প্রতীক—ফুল, মালা, সিন্ধি, ফল এবং মিষ্টি নিয়ে। এ পথে অভিজ্ঞ বন্ধুরা নানাভাবে উপদেশ দিল। জানালো কুমায়ুন বা গাড়োয়ালের চেয়েও এ পথ অনেক কষ্টকর এবং বেশী বিপদজনক। প্রতি পদক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। অকৃত্রিম বন্ধু ললিত চৌধুরী এই পথের বিবরণে বলেছিল, "ভারতে যত দুর্গম তীর্থ আজ পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের গোচরে এসেছে তাদের মধ্যে শিবতীর্থ কৈলাস সর্ব্বপ্রথম এবং এই দুরূহ-তীর্থ অমরনাথের স্থান, দ্বিতীয়। তবে তেমন কিছু নয়। তোমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হতে পারবে—মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপায়। ভাণ্ডেশ্বর খুবই অল্পে খুশী। তবে তাঁকে ধরার পথে একটু তাণ্ডব তো করতেই হবে। সীমানার ঘেরা নয়নে অসীমের কৃপা কল্পলোক রূপ দর্শন তো নিশ্চয়ই খুব সহজসাধ্য নয়। শরণাগতিতে গতি রেখে চলবে। সবই সহজ হয়ে উঠবে।" গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে এলো। ছেলে মেয়েদের চোখ জলে ভরে এলো। তাদের

চোখে চোখ রাখা সম্ভব হলো না। অন্যদিকে তাকিয়ে সাবধানে থাকতে বল্লাম মাত্র। গাড়ী ছেড়ে দিল ঠিক সময় মতো। "জয় প্রভু অমরনাথ" ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। বর্ধমান ছাড়বার পরে বাড়ীর তৈরী খাবার সকলে মিলে খেয়ে যে যার রক্ষিত জায়গায় শুয়ে পড়লাম। গাড়ী চলছে নির্ধারিত সাবলীল গতিতে। গতিবেগ বেশ দ্রুত। বালিশে কান পেতে আছি। মনে হোল যেন গাড়ীর ইঞ্জিন শিবের গাজন সংগীতে মুখর হয়ে উঠেছে। "হর হর হর শিব" ধ্বনি এবং সাথে সাথে চলছে নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য ঝঙ্কারের ছন্দ। গাজন সংগীত শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

আজ ওরা সেপ্টেম্বর শনিবার। ভোর হয়েছে। গাড়ী ষ্টেশনে থেমেছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি পাটনা। বিহারের রাজধানী। আদর্শ সম্রাট অশোকের বড় আদরের, মানসপুত্র স্বরূপ এই সেই পাটলীপুত্র। আজ পাটনা নামে পরিচিত। কত উত্থান কত পতন, কত জয় পরাজয়ের ইতিহাস এই পাটলীপুত্রের ধূলিকণায় মিশে রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের বিজয় পতাকার অবাধগতি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার থেকে সুদূর তিব্বত, চীন, জাপান পর্য্যন্ত একদিন ছিল অখণ্ড। মহান ভারতের সেই গৌরব উজ্জ্বল সুবর্ণ যুগ মহাকালের কোলে আজ নীরবে সমাধিস্থ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জ্ঞানপীঠ আজ সমাহিত এবং লুপ্ত। এই ভাঙ্গা গড়া মহাকালের পুতুল খেলা মাত্র। গাড়ী ভোর ৫ টায় এখানে এসেছে। ৫-১০ মিনিটে ছাড়ল।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীশরণাপুরী

দুই নয়ন ভরে দেখতে দিয়েছিলে
শত দুখের মাঝে
এই তো সান্ত্বনা
(তোমার) চরণ তলে বসতে দিয়েছিলে
শত দুখের মাঝে
এই তো সান্ত্বনা
ওই মোহন রূপে আমার সকল খানি
প্রভু তোমার মাঝে নিয়েছিলে টানি
পূজার মালা গাঁথতে দিয়েছিলে
শত দুখের মাঝে
এই তো সান্ত্বনা
ও দীননাথ আমায় ডেকেছিলে
নামটী ধরি বিশ্ব নিখিলে
সকল আঘাত সইয়ে নিয়েছিলে
শত ব্যাথার মাঝে
এই তো সান্ত্বনা।

জ্বলার সাথী

শ্রীপার্থসারথি ঘোষ

সেকালী করালো পথে আসিছে জননী
হেথা বাজে আনন্দের আগমনী গান
ব্যথাহরিত কবি ভবে চলিল ধরণী
খুঁজে নিতে বিশ্ব মাঝে কোথা তার স্থান।
শেল বিঁধিয়াছে বুকে, বিশল্যকরণী
কোথায় মিলিবে ভোলা? বৃথা অভিমান,
যে দুঃখে জ্বলিবে তুমি কয়েক রজনী
সেই বিষ, আমি জেন, নিত্য করি পান।
আলোকিত রোশনাই নিভিবে ধরার
বিষণ্ণ বিজয়া প্রাতে নয়নের নীরে—
ফিরিয়া সেদিন আমি আসিব আবার
তোমাদের মাঝে, বন্ধু, কুহু যবে নীড়ে।
জ্বলিতে আনন্দ মোর আমি নূর জ্বালা
যে জ্বলিছে তারি তরে মোর কণ্ঠ মালা॥

অভেদ-তিথি পূজা, মহালয়া ও মহাপূজা

স্বামী হীরানন্দ

বাংলার ছয় ঋতুর মধ্যে শরতের অপরূপ রূপের বুঝি তুলনা নেই। "শরৎ রূপের ইন্দ্রধনু" বাংলার সকল স্তরের মানুষকেই আনন্দ-মুগ্ধ করে। আর কবিকুলের তো কথাই নেই বাংলার শরৎ মরমী কবির বুকে যুগ যুগ ধরে জুগিয়ে চলেছে অমর কাব্য সৃষ্টির অনুপ্রাণ প্রেরণা। এই শরৎ কালেই দেবী দুর্গার মহাপূজা—বাঙালীর প্রাণের পূজা—নিজস্ব পূজা—জাতীয় উৎসব। শত দুঃখ কষ্ট অভাব অনটনের মাঝেও কত সাধ-আহ্লাদ-বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে বাংলার মানুষ সারাটি বছর দিন গোনে এই শারদীয়া মহাপূজার শুভলগ্নের আগমন প্রতীক্ষায়। বর্ষার কান্না শেষে শরৎ যখন জেগে ওঠে সোনালি হাসি হেসে বাংলার মন প্রাণও আনন্দে নেচে ওঠে শরতের বয়ে আনা আনন্দ সংবাদে—মা আসছেন। কবিও মহানন্দে জগতকে শোনান মার আগমনী :

"শরৎ কী শোভা কহ না যায়
শরৎ সুহানী আজ রে
মঙ্গল শঙ্খ পুকারে
সাজে সংসার সারে
ভোর গগন মুস্কাই রে।"...

—শ্রীঅর্চনাপুরী

কিন্তু বাংলার ভাগ্যাকাশে এবার নেমে এলো এক মহা-দুর্যোগ। সোনার বাংলার সোনার শরৎ এবার আর হাসলো না। মার আগমনের মঙ্গল শঙ্খ এবার বুঝি বাজলো না। জাগলো না নীল আকাশ—সেখানে উড়লো না মেষবলাকার দল। আকাশ জুড়ে শুধু জলভরা মেঘ। অবিরাম বর্ষণে ভাসলো পশ্চিমবাংলা। বাংলার মানুষের সারা বছরের বুক জমা সাধ-আহ্লাদ ভেসে গেল সর্বনাশা বন্যার স্রোতে। কত শত মানুষ, গবাদি পশু ভেসে গেল ঘর কুটোর মত সর্ববিধ্বংসী প্লাবনের বুকে। গ্রামের পর গ্রামের মাটির ঘর বাড়ী মাটিতে মিশে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কত গ্রাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন। বন্যা পীড়িত সর্বহারা বুভুক্ষু মানুষের বুকভাঙা আর্তনাদ আর চোখের জলে হারিয়ে গেল, ভেসে গেল, শারদ আগমনীর সব আনন্দটুকু।

এমনি বেদনাঘন নিরানন্দময় পরিবেশে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো শারদোৎসবের লগ্ন। সরানসর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শারদোৎসব সুরু হয়, বলতে গেলে, ষোড়শ-নবমীর শুভ তিথি থেকেই। কারণ এই পুণ্য তিথিই আমাদের পরমগুরু যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব তিথি। তাঁর শুভ আবির্ভাব স্মরণে আশ্রমে প্রতি বছরই এই তিথিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর আবির্ভাব-উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই আশ্রমে পড়ে যায় শারদোৎসবের ধুম। পর পর অনুষ্ঠিত হয় মহালয়া, আর দেবীদুর্গার মহাপূজা—মহোৎসব। এবারও বিধিবৎ যথানিয়মে পালিত হয়েছে অভেদ-তিথি-পূজা, মহালয়া দেবী দুর্গার মহাপূজা—হয়েছে সবই—তবে বর্তমান বন্যা-বিধ্বস্ত বাংলার মর্মন্তুদ পরিস্থিতিতে উৎসব-আনন্দ কি জাগে কারো প্রাণে! কাজেই সব কিছুই অনুষ্ঠিত হয়েছে বন্যার্ত ও দুর্গতদের জন্যে প্রার্থনা ব্যাকুল অন্তর নিয়ে ব্যথাভরা বুকে আড়ম্বরহীন ভাবগম্ভীর শান্ত পরিবেশে।

অভেদ-তিথি পূজা :

পরমগুরু স্বামী অভেদানন্দজীর পুণ্য আবির্ভাব স্মরণে ২৪ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার বিকেলে কবি ও সুধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান দিয়ে সূচনা হয় অভেদ-আবির্ভাব স্মরণ পূজো। সম্মেলনটা বড় আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাই দূরের ভক্ত পাঠকের কথা স্মরণ করে তার কথা একটু বলতেই হয়। এবারের কবি সম্মেলন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার মস্ত কারণ "আনন্দ-

বাজার" এর বিখ্যাত "রবিবাসরীয়" গোষ্ঠীকে পাওয়া। এজন্য অবশ্য সমস্ত কৃতিত্ব আশ্রমের পরম সুহৃৎ ও শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক অর্থাৎ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জ্যোৎস্নাদার। তাঁরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় "রবিবাসরীয়" আসর বসেছিল অভেদ-তিথি পূজার প্রাক্ লগ্নে আশ্রম অঙ্গনে। এই রবিবাসরীয় আসরে আমরা বাংলার যে সব খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক ও সুধীদের পেয়েছিলাম তার মধ্যে শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণধর মিত্র, শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, শ্রীঅমল গুপ্ত, শ্রীরমেন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য, শ্রীসুধেন্দু মল্লিক, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীঅরুণ মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যসচিব শ্রীবিনয় রঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমতী হেমপ্রভা মল্লিক, শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কবিকঙ্কন হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখনীয়। অনুষ্ঠানটীর পৌরহিত্য করেন "রবিবাসরীয়" গোষ্ঠীর সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। গঙ্গাধারে ঠাকুরের মন্দির বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও পরমগুরু অভেদানন্দজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সামনে আসন গ্রহণ করেছেন সকলে। শ্রীশ্রীঠাকুর, পরমগুরু মহারাজ এবং শুভাগত কবি সুধীগণকে চন্দনমাল্যে ভূষিত ও মঙ্গল শঙ্খধ্বনি সহ ধূপদীপ-প্রদীপ-আরতি যোগে সম্পন্ন হল বরণ পর্ব। শ্রীঅর্চনা মার লেখা "বিশ্বদীপার মোহন মন্ত্রে বাজালে অভেদ মন্ত্র / হে দেব অভেদানন্দ / জয়তু অভেদানন্দ / বিশ্ব নয়না-নন্দ"—অভেদ বন্দনা গানে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন স্বামী অরুণানন্দ। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্বামী মৃগানন্দের কণ্ঠে আমাদের ঠাকুরের রচিত "আঁখি জলে তাই এনেছি অর্ঘ্য" কবিতাটির আবৃত্তি দিয়ে সূচনা হল সম্মেলনের শুভ অনুষ্ঠানের। মর্মস্পর্শী কবিতাটির শেষ লাইনগুলিতে :

"নিত্যের বেশে গিয়েছ পুকারি দ্বারে দ্বারে কতদিন
শুনিনি সে কথা বুক ভাঙ্গা ব্যথা বাজিনি তো পরাণে,
হতে গেছ মা'র বলি
যেমন আর্তি ভুলি
তিল তিল করি বিলায়েছ নিজে বিশ্বের অধিরাজ
আঁখি জলে তাই এনেছি অর্ঘ্য রিক্তের বাথা লাজ।"

আরাধ্য দেবতার চরণে কবি সাধক সত্যানন্দদেবের আত্মনিবেদনের ভাবটির কি অপূর্ব বাঙ্ময় প্রকাশ! শ্রোতৃ-মণ্ডলী ভাবতন্ময়ে শোনেন কবিতাটি। মৃগানন্দজী তারপর পাঠ করেন পূজনীয়া শ্রীশরলাপুরীর একটি সুন্দর অভেদ-প্রশস্তি "জ্ঞানের দিশারী অভেদানন্দ"। স্বামী অরুণানন্দ শোনালেন স্বরচিত কবিতা "আর কবে?" তাঁর কবিতায় সাম্যের বলিষ্ঠ প্রকাশ সকলের অন্তরকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। সভাপতি কালীকিঙ্কর বাবু কবিতাটি শুনে মুক্তকণ্ঠে মন্তব্য করেন—"আপনার কবিতায় সমাজের একটা হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে"। পূজনীয়া শ্রীঅর্চনা মা পাঠ করেন স্বরচিত দুটি কবিতা—"চিন্তা করেছ কি" ও "জন্মবোধন"। কাব্যমাধুর্যে ও দিব্য ভাবদ্যোতনায় দুটী অনবদ্য সৃষ্টি। কি গভীর ভাবদ্যোতক "জন্ম বোধনের" শেষ স্তবকটি :

"আজকের আকাশের অপরাজিতার মালা
তুমি আমি সবার জন্য।
তোমরা যে মালা নিবেদন করবে
আমার বোধন মাঙ্গলিককে
আমি আবার সেই প্রসাদী মালায়,
তোমাদের সবার পরাজয়কে
জয়ের মালায় বরণ করে নেব।
তবেই তো সার্থক হবে আমার জন্মবোধন।"

অভেদানন্দ-আবির্ভাব তিথি—বোধন নবমীরাই যেন এক মহান আশ্বাস বাণী সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে এই লাইনগুলিতে। তাই মুগ্ধশ্রবণে কবিতাটি শোনার পর কবি কালীকিঙ্কর বাবুর সশ্রদ্ধ উক্তি "আমরাও অপরাজিতার প্রসাদী মালা সানন্দে ধারণ করে ধন্য হলাম" শুনে শ্রোতারাও আনন্দিত হন সমধিক। এরপর এক এক করে বাংলার স্বনামধন্য কবিকুল এগিয়ে এলেন কাব্যের অর্ঘ্য নিয়ে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলেন সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ সুধেন্দু মল্লিক, কৃষ্ণ মিত্র, রমেন মল্লিক, অনিল ভট্টাচার্য, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, বেলা দেবী

প্রমুখ কবিকণ্ঠে তাঁদের স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি। প্রত্যেকটি কবিতাই সুন্দর। সুধেন্দু মল্লিকের গোপালধূলীকে নিয়ে ছোট্ট আধুনিক কবিতা "বালক প্রভু" শুনে মনে হল আধুনিক বাংলা কাব্যে এক নতুন দিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। শুধু কাব্য পরিবেশনই সভার একমাত্র আকর্ষণ ছিল না। ছোট গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ এবং জ্ঞানগর্ভ প্রাঞ্জল আলোচনাও রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে সম্মেলনকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

শ্রীবনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর লেখা একটি ছোট গল্প। গল্পটার বিষয়বস্তু হ'ল পিতার কোলে বসে ছোট্ট মেয়ে ট্রেন পথে কলকাতায় চলেছে। পিতা নানা সমস্যায় জর্জরিত ও চিন্তাক্লিষ্ট। পথে সহযাত্রী এক কাবুলিওয়ালা ও কমবেশী কন্যাটির সঙ্গে আলাপের অবসরে সকৌতুকে তাকে একটু ভয় দেখিয়ে বলে "এই খুকী, তোমাকে ধরে নিয়ে যাবো"। খুকী কিন্তু বাবার কোলে বসে পরম নিশ্চিন্তে উত্তর দেয়, "বাবাকে বলে দেবো, বাবা তোমাকে বোকবে"। শেষে তারা তাদের আপন আপন গন্তব্যস্থলে নেমে গেলে, কন্যা পিতাকে বল্লো—"দেখলে তো বাবা, তোমাকে বলে দেবো বলেছি, তাই ভয় পেয়ে ওরা নেমে গেল।" পিতার উপর শিশুর সরল বিশ্বাস ও পরম নির্ভরতার এই অপূর্ব দৃষ্টান্ত সমস্যাপীড়িত দিশেহারা পিতারও চোখ খুলে দেয়। তিনিও পরম পিতার উপর সব সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হন। ভাষা শৈলী ও পরিবেশন নৈপুণ্যে গল্পটী খুবই মর্মস্পর্শী হয় শ্রোতাদের কাছে। শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূল কথা যে be and becoming—অর্থাৎ "হওয়া"র সাধনা, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মার ওপর একটী স্বরচিত সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করে সকলকে খুব আনন্দ দেন। কবিসুন্দর কুমুদরঞ্জনের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র কবি-সাহিত্যিক শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক "ইমারসনের কবিতা 'ব্রহ্ম' ও স্বামী অভেদানন্দের ব্যাখ্যা" নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসঙ্গানুগ সারগর্ভ আলোচনা করে সম্মেলনের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রবন্ধটি এই সংখ্যাতেই অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। সভায় পঠিত কবিতাগুলিও 'ভাবমুখে'তে এক এক করে প্রকাশিত হবে। সবশেষে সভাপতি কালীকিঙ্কর বাবু কথামৃত, গীতা, উপনিষদ নিয়ে এক অপূর্ব সমন্বয় ধর্মী আলোচনা উপহার দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দে অভিভূত করে তোলেন। তাঁর বাগ্মীতা সকলকে মুগ্ধ করে। প্রত্যেকটি কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার শেষে তাঁর এক একটি নাতিদীর্ঘ মন্তব্য এবারের কবি সুধী সম্মেলনকে বড় প্রাণবন্ত করে তুলেছিল—সকলের মনেই একটা বিশেষ দাগ রেখে দিয়েছে।

শ্রীঅর্চনা মার লেখা "আমরা এক নতুন যুগের ইতিহাসের সাক্ষী / কথায় আঁকা ছিন্ন কোন পাণ্ডুলিপি নয় এযুগ সত্যানন্দময় আমরা সত্যানন্দময়" গানে রবিবাসরীয় কবি ও সুধী সম্মেলনের চল মধুর সমাপ্তি। গানটি পরিবেশন করেন স্বামী কৃপানন্দ। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দান করে ছোট্ট দুটি গায়িকা শিবানী ও সর্বাণী। গানটি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন সবাই। শুনছিলেন কালীকিঙ্কর বাবুও। গানটি শেষ হতেই তিনি সানন্দে বলে ওঠেন—"আমরাও সত্যানন্দময় হয়ে গেলাম।" কালীকিঙ্কর বাবুর এই অনুভবধন্য অভিব্যক্তিতে সত্যানন্দ ভক্তপ্রাণেও খেলে গেল আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরণ। অনেকেই বললেন গত দশ বছরে আশ্রমে এমন সম্মেলন হয়নি।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ২৫শে সেপ্টেম্বর—বোধন নবমী—যুগাচার্য স্বামী অভেদানন্দের পুণ্য আবির্ভাব তিথি। এদিন সকালে আশ্রমের সাধু ও ভক্তরা কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে গিয়ে অভেদানন্দজীর মহাসমাধিপীঠে মাল্যদান করে আসেন নাম গান ও আরতি সহায়ে। এরপর ঠাকুরের বারান্দায় সঙ্ঘসচিব পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সত্যজ্ঞানন্দজীর পরিচালনায় সাধু ও ভক্ত সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র। এই অনুষ্ঠানে গীতা, কথামৃত, যুগে যুগে যার আসা, যুগাচার্য, আমার জীবন কথা, শ্রবণ মঙ্গলম্, জননী সারদেশ্বরী ইত্যাদি দিব্যগ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ হয়। আশ্রম মন্দিরে চণ্ডীপাঠ, আরতি, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি সহ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা মা, সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর ও শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে বহু ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ অন্ন প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত

হন। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে অভেদ স্বামীর পূত জীবনবেদ আলোচনার মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হয় অভেদানন্দ তিথি পূজো।

মহালয়া :

অভেদ-উৎসবের পর ১লা অক্টোবরে পড়ল মহালয়া—সুরু হল দেবীপক্ষ। দেবী দুর্গা দুর্গতিহারিণী। তিনি অশুভ শক্তি বিনাশিনী ভীমা-রুদ্রাণী। আবার তিনিই শুভ শক্তি প্রসারিণী বরদাত্রী ক্ষেমঙ্করী। আজ চারিদিকে অশুভ আসুরিক শক্তির প্রাদুর্ভাবে শুভশক্তির বিকাশ ও দেবত্বের প্রকাশ সততই বিঘ্নিত ও ব্যাহত। কাজেই শুভ শক্তিদায়িনী দনুজদলনী দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গাকেই আবাহন করতে হবে অন্তর মন্দিরে। তাই মহালয়ার পুণ্যাহে সন্ধ্যায় আশ্রমে শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত "অশুভ শুম্ভে খণ্ডিতে মা" গীতি-আলেখ্য পরিবেশন মাধ্যমে আবাহন জানান হল বিঘ্নবিনাশিনী মহাদুর্গার চরণে। গীতি আলেখ্যটি সদ্য লিখেছেন শ্রীমর্চনা মা। সঙ্গীতগুলির সুরারোপও তিনিই করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনাও তাঁকেই করতে হল। মা'র সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছেন মৃগানন্দজী, শিবানী, সর্বাণী প্রভৃতি সাধু ভক্তরা। তবলা সঙ্গত করেন আমাদের ব্রহ্মচারী গদাধর চৈতন্য। আলেখ্যটি পাঠ করেছেন স্বামী অরূপানন্দজী। মা নিজে সঙ্গীত পরিচালনা করায় এবং অরূপদার দরদী পাঠের গুণে আলেখ্যটা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। গীতি-আলেখ্যর পর শ্রীমতী গীতালি সেনগুপ্ত ও সম্প্রদায় ভক্তিমূলক রাজস্থানী সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের খুব আনন্দ দেন। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ সঙ্গীতে ছিলেন শ্রীমতী রত্না সেনগুপ্ত, শ্রীস্বপন মুখার্জী ও সুদর্শ দাশ। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন শ্রীচিররঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীসুদীপ সেনগুপ্ত। সবশেষে রত্না সেনগুপ্তের একক-কণ্ঠে এবারের সর্বনাশা বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমর্চনা মার লেখা ও সুর দেওয়া "এতো বিধাতার রোষ নয় / এতো আমাদেরই অপরাধ" গানখানার করুণ আবেগ বুক নিঙড়ে দিয়েছে শ্রোতাদের। চোখের জল আর বাঁধ মানে নি। কি গানই না গাইল রত্না। মনে হল একটি ছোট্ট মেয়ে খুব মিষ্টি গলায় করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে গাইছে গানটি। স্বামীজী তো কান্নায় ভেঙে পড়েন। রত্না গানখানা মার কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মার সুর ও সৃষ্টি কাজগুলি বড় সুন্দর রূপ করেছে। স্বামীজী, মা ও শ্রোতাদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ নিয়ে গেল এবার রত্না।

মহাপূজা :

মহালয়ার কদিন পরই মহাদুর্গার মহাপূজা। মা আসছেন—কিন্তু পূজোর সে আনন্দ কই! গোড়াতেই বলেছি, এবারের ভয়াবহ বন্যা পূজার সব আনন্দ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে মানুষের মন থেকে। এমনি আর এক বিষাদঘন শারদীয়া পরিবেশে মানুষের দুঃখে কাতর 'আমাদের ঠাকুর যে বেদন আগমনী গেয়েছিলেন সেদিন, আজ সেই গানখানারই কলিগুলি কানে যেন বড় বেশী করে বাজছে :

"বেদন আগমনী গাহিব আজি কি গো
জননী সেজেছো অশ্রুহারে
করুণ করে কোথা কাশের গুচ্ছি ধরা
কোরেল কলভরা কাঁদনী চারিধারে।"

নিরানন্দময় থমথমে আবহাওয়া চারিদিকে—আশ্রমেও। প্রত্যেকবার পূজোর সময় আশ্রম গমগম করে অন্যান্য শাখা আশ্রম থেকে আগত সাধু ব্রহ্মচারী ও দূরাগত ভক্ত সমাগমে। এবার আশ্রম ফাঁকা। সেবায়তনের এত দিনের ঐতিহ্যময় পূজো কে করবে সেটাও একটা চিন্তার কারণ হয়ে পড়ল। তন্ত্রধারক শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরী (মিঠুদা) এবং যাঁরা পূজো করেন, স্বামী নীলানন্দজী ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী, তাঁদের কারুরই আসা সম্ভব নয়। প্রথম কথা, আসার পথগুলি সব বন্যায় বিধ্বস্ত। সিউড়ীর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, সিউড়ী আশ্রমের স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী, স্বামী নীলানন্দজী প্রভৃতি সকল স্বামীজীরাই প্রাণপণে নেমেছেন ও অকলের ত্রাণ কাজে। অন্যান্য শাখা আশ্রমের সাধুরাও আপন আপন এলাকায় ঝাঁপ দিয়েছেন বন্যা দুর্গত মানুষের সাহায্যে। কাজেই ও আশ্রমে এখন আসা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কারণেই চিন্তা—পূজোর কি হবে? কে করবে?

মার পূজো তো করতেই হবে। এই দুঃখের অমানিশায় সর্বদুঃখ আত্তিহারিণী মহাদুর্গাই এক মাত্র ত্রাণকর্ত্রী – মহাসঙ্কটে মাকেই তো ডাকতে হবে বুক নিঙড়ে। ঠাকুরও তো ঐ বেদন আগমনীতে মাকেই করেছেন আবাহন :

"রূপের জোছনায় আয় মা ফিরে আয়
বাথায় ভাঙ্গা ঘরে।"

কাজেই মার পূজোর ব্যবস্থা এখান থেকেই করতে হ'ল। স্থানীয় ভক্ত শ্রীঅনিল মুখার্জীকে পাওয়া গেল তন্ত্রধারক রূপে পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী সাধনাপুরী বসলের দেবীর বোধন আমন্ত্রণ ও অধিবাস পূজোয়। মনে পড়ল ঠাকুরের আর একটি করুণ আগমনী :

"বোধন আবার বসল মাগো
বুকের বেদনে
তাই নয়ন জলে অর্ঘ্য সাজাই
আপন মনে।"

স্বামী সুরেশ্বরানন্দজীর দায়িত্বটা বহন করলেন এ আশ্রমের ব্রহ্মচারী শরণ চৈতন্য (মন্টুদা)। সুন্দর পূজো করলেন সাধনা মা। মহাষষ্ঠীপূজো নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল। সপ্তমী থেকে পূজকের আসনে বসলেন আশ্রমেরই অপর এক সাধু। মহাসপ্তমীর দেবীর নবপত্রিকা স্নানাদি, মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা ও ১০৮টি ডিয়ের প্রদীপে দেবীর আরতি, মহানবমীর হোমানুষ্ঠান, বিজয়ার শান্তিপাঠ ও শান্তিজল দান, গঙ্গায় পট বিসর্জন ও সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মেলন সবই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে মায়েরই কৃপায়। প্রতি বছরের মতই আশ্রমের নিত্য পূজিত দ্বিভুজা সারদা বিগ্রহতেই দশভুজা দুর্গারূপে সারদা দুর্গার হয়েছে পূজো। উমামহেশ্বরী, যোগিনী, রাজরাজেশ্বরী ইত্যাদি এক এক দিন এক এক বেশে সেজেছেনও মা প্রতিবারের মতই।

পূজার অন্যান্য অনুষ্ঠান বলতে এবার শুধু একদিন সন্ধ্যায় আমাদের ঠাকুরের লেখা গীতি-আলেখ্য "দরদী ঠাকুর" ও কিছু ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন আমাদের আলাম-বাজার মঠের ভক্ত বায়েরা। বন্যার জন্যে অন্যান্য আশ্রমের পূজোর সংবাদ কিছু পাওয়া যায় নি। তবে যাদবপুর শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন থেকে শ্রীমতী চিত্রিতা চৌধুরী সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, দেবায়তনে এবার একটি ছোট্ট দশভুজা সারদা দুর্গা প্রতিমা গড়ে মার খুব সুন্দর পূজো হয়েছে। পূজো করেছেন শ্রীসোমেন ব্যানার্জী। তাঁর ভাবতন্ময় পূজোয় ভক্তরা খুব প্রেরণা পেয়েছেন। মূর্তিটি গড়ে দিয়েছে দেবায়তনেরই ভক্ত ছেলে কালিদাস। দেবায়তনের এক ভক্তের স্বপ্নদর্শনের ফলেই প্রতিমা গড়ে পূজো এবার। পূজোর সব আয়োজনও মূলতঃ তাঁরই। ওখানে পূজোর আগের দিন পঞ্চমীর সন্ধ্যায় শ্রীমতী গীতালি সেনগুপ্ত ও সম্প্রদায় "অসুর শুম্ভ বধিতে মা" গীতি-আলেখ্যটি পরিবেশন করেছেন। শ্রীমতি রত্না সেনগুপ্ত মার লেখা বন্যার গানখানাও গেয়েছে এবং কিছু ভক্তিমূলক রাজস্থানী সঙ্গীতও ওঁরা শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছেন ভক্তদের।

পূজো শেষ হতেই বন্যাত্রাণ কাজে আশ্রমকে নামতে হল আরও ব্যাপক ও গভীর ভাবে। যদিও প্রথম বন্যার সময় থেকেই আমাদের ত্রাণ কাজ সুরু হয়েছে। আশ্রমের বন্যা ত্রাণ সংবাদ আমরা 'ভাবমুখে'তে অন্যত্র প্রকাশ করেছি। এখন চতুর্দিক থেকে আসছে চিঠি। চিঠি তো নয়, যেন S. O. S – সাহায্য পাঠাও। "শিব জ্ঞানে জীব সেবাই"- এখন যথার্থ পূজা—একমাত্র পূজো—

"দুয়ারি শিব পুকারী ফেরে
দুয়ারে মা তোর কেঁদে কেঁদে
সেধে সেধে।"

—শ্রীসত্যানন্দদেব।

ভ্রম সংশোধন

এবারের শারদীয়া "ভাবমুখে"তে যে "পুস্তক সমালোচনা" প্রকাশিত হয়েছে তাতে একটি মুদ্রাপ্রমাদ ঘটে গেছে। "পুস্তক সমালোচনা"র চৌদ্দ পৃষ্ঠার শেষ দুটী লাইন "প্রযুক্ত হয়েছে..... তাঁর নিজস্ব" পনের পৃষ্ঠার সর্বশেষ লাইনটীর আগে অর্থাৎ "আলোকের ঝরের দুলাল' বইয়ে যে সব বাকবিধি"র পর হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। —ভাঃ সঃ

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু সরস্বতী

(অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি—কলিকাতা হাইকোর্ট)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আমরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটি মার্গকে দিঙ্‌নির্দেশক অভিহিত করিয়াছি, কারণ মোক্ষপথযাত্রী পূর্ব্বদিকে কি পশ্চিম দিকে যাত্রা করিবেন তাহাই তিনি স্থির করিবেন এই দুটি মার্গের একটিকে নির্বাচন করিয়া। কিন্তু তাহাতে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না, কারণ প্রত্যেকটি মহা-মার্গ হইতে বিভিন্ন পথ নির্গত হইয়াছে। যদি তাহাদের একটিকে গুরুর নির্দেশ অনুসারে বা (যতদিন উপযুক্ত গুরুর সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়, ততদিন নিজের আন্তরিক প্রবৃত্তি ও অনুপ্রেরণার সাহায্যে) স্থির সিদ্ধান্তে অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে সারাজীবন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এবং পথ নির্ণয়ের পূর্বেই সংক্ষিপ্ত পরমায়ু শেষ হইয়া যাইবে।

জ্ঞান, ধর্ম, ভক্তি এবং রাজযোগ এই চারিটি পথ মহা-ভারতীয় যুগে স্বীকৃত হইয়াছে দেখা যায়।[২৩] যদিও পরবর্তী যুগে এই পথগুলি হইতে অগণিত শাখা ও উপ-শাখা উদ্ভূত হইয়াছে; ব্রহ্মের সম্পাদনরূপ সারতত্ত্বের অন্বেষণের পক্ষে এই চারিটি যোগের মূল নির্দেশগুলির আলোচনাই প্রশস্ত হইবে কারণ কোনও উপশাখাই এ-গুলিকে অস্বীকার করিয়া নিজগোত্রের পরিচয় দিতে পারিবেন না।

পাশ্চাত্যমতে যে কোনও বিদ্যার্জনের নাম জ্ঞানলাভ (knowledge)। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে 'জ্ঞান' বলিতে কোনও ব্যবহারিক তত্ত্ব আহরণ বুঝায় না। যাঁহাকে জানিলে অন্য সব কিছুই জানা হইয়া যায়,[২৪] কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি বিভিন্নরূপে, নামে বা উপাধিতে প্রকাশিত[২৫ক], সেই ব্রহ্মকে জানা বা আত্মজ্ঞানকেই 'জ্ঞান' বলা হয়। যে পদ্ধতিতে এক ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা[২৬] বা জ্ঞানযোগ বলা হয়।

ব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞাতব্য আর কিছু নাই,[২৭] কারণ তিনিই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তিনিই একাধারে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ কার্য্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন।[২৮] তাঁহাকে জানিলেই সব জানার শেষ হইবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তির জন্য আর কিছু জানার প্রয়োজন নাই, কারণ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার অবিদ্যাজনিত সর্বপ্রকার সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং তিনি পূর্ণকাম হইয়া মুক্তিলাভ করেন।[২৯] একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়,—মুক্তির অন্য উপায় নাই।[৩০]

কিন্তু ব্রহ্ম যে অব্যক্ত, অকায়, নিরবয়ব, বাক্, মন, চক্ষু ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর[৩১], অধ্যয়ন বা মেধার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না[৩২], তবে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি?

ইহার উত্তর দিয়াছেন উপনিষদের ঋষি অতি সংক্ষেপে—'নিজেকে জান'[৩৩] বা 'নিজের স্বরূপকে জান'।[৩৪]

যিনি সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা, তিনিই আমার শরীরস্থ অন্তর্যামী আত্মা[৩৫]। যেহেতু তিনি নিজদেহের মধ্যেই লুক্কায়িত আছেন, সেইজন্য এই দেহের মধ্যেই জ্ঞান-যোগে তাঁহাকে জানিতে হইবে।[৩৬] যদি কেহ বিস্ময়কর সেই বিশ্বাত্মাকে নিজের হৃদয় গহনে দর্শন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি সকল দুঃখ ও বিনষ্টি অতিক্রম করিয়া, নিজেই বিশ্বময় হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবেন।[৩৭] একবার যিনি স্বীয় আত্মার স্বরূপ অর্থাৎ তাহার সহিত পরমাত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি কি আর নশ্বর বস্তু সমূহের কামনায় শরীরের ভজনা করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন?[৩৮]

এই আত্মজ্ঞান বা আত্মার স্বরূপোপলব্ধি দুইটি মহাবাক্য

নির্দেশিত পথে অগ্রসর হইবে এবং সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমগ্র উপনিষদ্ রাজি প্রতি পদে পদে মানুষকে এই দুইটি সত্যের ধারণা করিতে প্রস্তুত করিয়াছে।

এই মহাবাক্য দুটি হইতেছে—(ক) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি সেই ব্রহ্মই)[২৩], (খ) 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (নিখিল জগৎ সকলই ব্রহ্ম)[২৪] জ্ঞানযোগের মূল সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিলেই, এই দুইটি মহাবাক্যের উপলব্ধি সুগম হইবে।

(ক) প্রশ্নের মীমাংসাকে 'বিচার' বলে। জ্ঞানযোগের প্রথম সোপানে যে জিজ্ঞাসা থাকা চাই সেটি হইতেছে—'আমি কে'?

উপনিষদের ঋষিগণ এই প্রশ্নের বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রক্তমাংসের গড়া এই দেহ বা ইহার কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 'আমি' নহি[২৫]; ইহাদের সকলকে পরিচালিত করিতেছে এমন কোনও চৈতন্য এবং যেটির অভাবে দেহটি মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়[২৬]। এই বস্তুর নাম আত্মা এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, দেহ বিনাশশীল, কিন্তু দেহের বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না।[২৭] পরন্তু, এই আত্মা অজর, অমর, শাশ্বত ও সনাতন এবং একটি দেহান্তে নব নব কলেবর ধারণ করিয়া বর্তমান থাকে[২৮]।

(খ) দেখা গেল যে, আমার দেহস্থ আত্মা ব্রহ্মেরই ন্যায় অবিনাশী ও বন্ধনহীন। কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞানতা বশতঃ আমি নিজকে পরমাত্মা হইতে পৃথক মনে করিতেছি এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না যে, সেই বিশ্বাত্মাই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত আছেন এবং সেই জন্যই আমার অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন সত্তা[২৯]। এই অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা দূর করিবার পন্থাকেই জ্ঞানযোগ বলে। এই জন্যই উপনিষদ্ নিজের স্বরূপ জানিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যাঁহার এই আত্ম-স্বরূপ বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই অকপটে ঘোষণা করিতে পারিবেন—'আমিই' সেই ব্রহ্ম'।

(গ) দ্বিতীয় মহাবাক্যটিও সেই একই সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিবর্তনবাদ হইতেই উদ্ভূত এবং একটি ব্যতীত অপর বাক্যটির প্রকৃত উপলব্ধি হইবে না। যিনি সর্বভূতে এবং সর্বত্র বিরাজমান তিনিই আমার মধ্যে অন্তর্যামী আত্মা, কারণ সকলই সেই বিশ্বাত্মার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ।[৩০] তিনি শুধু আমার অন্তরাত্মা নন, তিনি সর্বভূতান্তরাত্মা।[৩১]

এই জন্যই জ্ঞানযোগীর প্রকৃষ্টতম লক্ষণ হইতেছে সমদর্শন বা সমবুদ্ধি।[৩২] তাঁহার শত্রু মিত্র বোধ নাই, তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গো-হস্তী-কুকুরে ভেদ নাই[৩৩]। কারণ, অবিদ্যার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া যিনি নিজের সহিত ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করিতে চান, তিনি সেই ব্রহ্মকেই সর্বভূতে বিরাজমান দেখিতে পান[৩৪] এবং যাঁহার এই সামগ্রিক একত্ব উপলব্ধি হয়, তিনি নিজেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।[৩৫] তখনই তিনি জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া অকপটে ঘোষণা করিতে পারিবেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'[৩৬]।

অতএব, জ্ঞানযোগী অপরের প্রতি উদাসীন এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত, পরন্তু, নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়া, শুধু মানবজাতি নহে, ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় জীবের ঈশ্বরজ্ঞানে সেবাই তাঁহার সাধনার চরম সোপান।[৩৭] সেই অবস্থায় তাঁহার উপাসনা পর্যন্ত থাকে না, কারণ যিনি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন, তিনি কাহার উপাসনা করিবেন[৩৮]?

২৩। বৃ (১।৪।১০)—'লোকেঽস্মিন্ ··যোগিনাম্'; (৪।৪।১৯)—'অপানে··প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'; ··৯।১৪-১৫)—'···নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা··জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে···', ··।১৩।২৬)—'ধ্যানেনাত্মনি···কর্মযোগেন চাপরে'।

২৪। ছা (৩।১৪)—'যেন অশ্রুতং···বিজ্ঞাতং'; বৃ (৮।৪।৬)—'আত্মনি খল্বরে সর্বং বিদিতং'; মু (১।১।৩)—'কস্মিন্ ···বিজ্ঞাতং ভবতীতি'।

২৫। (ক) মু (২।২।১১)—'···ব্রহ্মৈবেদং···বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্'।

২৬। মু (১।২।১৩)—'··· যেনাক্ষরং· ব্রহ্মবিদ্যাম্'।

২৬। যে (১।১২)—'···নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ'; প্রশ্ন (৬।৬-৭)—'অথ যা ইব ··তং বেদয়ং পুরুষং বেদ··· নাতঃ পরমস্তীতি'; মা (৭)—'···স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ'।

২৭। যে (১।১)—'জ্ঞাত্বৈ···ব্রহ্মমেতৎ''

২৮। শ্বে (১।১১)—'আত্মা বেদঃ···আপ্তকামঃ'; ক (২।৩।৮)—'—যং জ্ঞাত্বা···অমৃতত্ব চ গচ্ছতি'; মু (৩।২।৯)—'স যো···পরমং ব্রহ্ম বেদ···অমৃতো ভবতি'।

২৯। শ্বে (৩।৭।৮)—'··· তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি···নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

৩০ ক (২।৩।৯; ২।৩।১২)—'নৈব বাচা···ন চক্ষুষা'; মু (৩।১।৮)—'ন চক্ষুষা···কর্মণা বা···'।

৩১। ক (১।২।২৩)—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন···'।

৩২। মু (২।২।৫)—'···জ্ঞানথ আত্মানম্···'; (৩।১।৯) 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ···'; বৃ (২।৪।৫)—'··· আত্মা বা অরে···বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্'. (৪।৫।৬।—' আত্মনি খলু···বিজ্ঞাত ইদ সর্বং বিদিতম্' : ছা (৮।৩।৩ —'স বা এষ আত্মা ···এবং বিদ স্বর্গং লোকমেতি'।

৩৩। ছা (৮।৭।১)—'য আত্মা···বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ···'; ৮।১।১)—'অথ যদ্মিন্নিন্···বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি; (৮।৩।৪) 'অস—শরীরাৎ সমুত্থায়···স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এতদমৃত-মভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি···'; শ্বে (১।১২)—'এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্ '; কে (২।৪)—'···আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্'; বৃ (৪।৪।১২)—'আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ···'।

৩৪। বৃ (৩।৭।১৫)—'···যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত···'।

৩৫। মু (৩।১।৭)—'···পঞ্চধা হ্যেষ বিহিতং গুহাশয়ম্।' ক (২।৩।১৭)—'তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ···' মু (২।২।৮)—'মনোময়ঃ···তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা···'।

৩৬। বৃ (৪।৪।১৩-১৭)—'যস্তানুবিদ্য···তমেব ধীর আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্; ক (২।২।১২-১৩)—'একো বশী···তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ···'; শ্বে (৬।১২)—একো বশী···নেতরেষাম্'।

৩৭। বৃ (৪।৪।১২)—'আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ···শরীরমনুসংজ্বরে'।

৩৮। বৃ (১।৪।১০)।

৩৯। ছা (৩।১৪।১)।

৪০। ক (২।২।৪-৫)—'অস্য বিস্রংসমানস্য·····উপা-শ্রিতো'।

৪১। ক (১।৩।৩)—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি···মনঃ প্রগ্রহমেব চ'।

৪২। ক (১।২।১৮)—'ন জায়তে ম্রিয়তে···হন্যমানে শরীরে'; গী (২।২০)—'ন জায়তে ম্রিয়তে···হন্যমানে শরীরে'।

৪৩। গী (২।২২-২৪)—'বাসাংসি জীর্ণানি···সনাতনঃ'

৪৩(ক)। মা (২)—'···অয়মাত্মা ব্রহ্ম···'।

৪৪। বৃ (২।৪।১)—'যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্'; (৪।৪।১৯।—'···নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন ···'; (১।৪।৭)—'···স এষ ইহ প্রবিষ্ট···'; (২।৫।১৯।—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব···অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ···'; ক (২।২।১০)—'বায়ুর্যথৈকো···রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ' ছা (৬।৮।৭)—'স য···ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং···স আত্মা তত্ত্বমসি'।

৪৫। মু (২।১।৪)—'অগ্নির্মূর্ধা···সর্বভূতান্তরাত্মা'; মা (৬) ...এষোঽন্তর্যামী···'।

৪৬। গী (১২।৩-৪)—'যে ত্বক্ষরং···সমবুদ্ধয়ঃ···সর্বভূত-হিতে রতাঃ'।

৪৭। গী (৫।১৮)—'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে···সমদর্শিনঃ'।

৪৮। ঈশ (৬-৭)—'যস্তু সর্বাণি ভূতানি···একত্বমনু-পশ্যতঃ', ; কেন (২।৫)—'···ভূতেষু ভূতেষু···অমৃতা ভবন্তি'. কৈ (১।১০)—'সর্বভূতস্থমাত্মানং···সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম···।'

৪৯। গী (১৩।৩০)—'যদা···ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা'।

৫০। বৃ (১।৪।১০)।

৫১। গী (৪।২৫)—'দৈবমেবাপরে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ···সর্ব-ভূতহিতে রতাঃ'।

৫২। বৃ (৪।৫।১৫)—'যত্র ত্বস্য···তৎ কেন কং পশ্যেৎ···'।

গম কী রাত

স্বামী ভূপানন্দ

কিসীনে নহী রাগ ন ছেড়ী
জিন্দগী য়ুঁ হী বীত গয়ী
এক হী সুর ছেড়কর
গমকী রাত চল গয়ী ॥

সুখ সবেরা ন আয়া
আঁখো মে আঁধেরা ছায়া
তু নে ভী হায় নহী
কোঈ গীত না গায়া
কিসীনে ন রুকী
কোঈ বাত নহী
গম কী রাত চল গয়ী ॥

এক হী ধুন গাতে গাতে
থকা রাহী রাতে রাতে
বিরহা কা সুর হী
টুটে তারোঁ সে ফিরতী
বজাতা গয়া উও
উঁগলী ন রুকী
গম কী রাত চল গয়ী ॥

দিল মেরা ন সমঝে
অশ্ক সে হায় তুঝে
কুঁ হো গয়া হে পার
যাঁয় থক গয়া পুকার
পথর দিলমে ফিরতী
ন আয়ী নমী
গম কী রাত চল গয়ী ॥

॥ নামের মালা ॥

শ্রীআরতি বসু (শান্তিনিকেতন)

সকাল সন্ধ্যা নামের মালা গাঁথি
সকল কাজের ফাঁকে,
আঁধার-আলোয় দুঃখে-সুখে রাতি,
নামটি শুধু থাকে।
যে নামেতে হৃদয় প'লে ঝরে
সোনার ধারাখানি
যে নামেতে লুকিয়ে করে জড়ো
সকল স্নেহের বাণী,
সে নাম থাকুক আমার হৃদয় মাঝে
মায়ের নামে নামে
সেই নামেতেই মনের বীণা বাজে
ভালবাসার গানে।

তোমার নয়ন দানে

স্বামী অরূপানন্দ

ওগো সহজ ওগো সুন্দর
ওগো সত্য
তুমি এসো আমার সমুখে
আমার প্রাণে
এস আমার গানে
আমি তোমায় দেখব সহজ চোখে
অনুভব করব তোমার আলো
একান্ত আপন ভাবে—
যা ছড়িয়ে আছে এ ধরার অঙ্গে অঙ্গে
আকাশে বাতাসে
সাগরে নদীতে
গাছে গাছে ফুলে ফুলে
অণুতে অণুতে
প্রাণে প্রাণে।

তুমি এস একবার
সে সহজ অপরূপে
তাই জ্বালিয়েছি এ জীবন ধূপে
তোমারই প্রসন্ন আশিষে—
ভরে যাবে এ পাত্রখানি
নিজেকে হারিয়ে ডুব দেবো
তোমার রূপে রূপে।
ওগো আপন!
বুকের প্রতি স্পন্দনে
থাক তুমি নিবিড় হয়ে
বাইরে দেখা সাঙ্গ করে—
যখন চাইব ভেতর পানে
গভীর প্রশান্তি ভরা চোখে
তখন আমার পূর্ণ কোর—
তোমার নয়ন দানে।

প্রশান্তি

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

জীবনে অনেক গ্লানি জমা হয়ে হয়ে—
একদিন নিষ্ফল আক্রোশে
ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে
আশ্বাসের দীর্ঘ হাতছানি
আবর্তের ভয়ার্ত বাতাসে—
মালতীর কম্র দেহখানি
খসে পড়ে শুষ্ক ভূমে রুদ্ধ নিরুপায়ে।

সৈকতের বালুকণা গোধূলির পড়ন্ত বেলায়
আপনার জন্মতীর্থ পথে
বারে বারে ফিরে যেতে চায়।

অমানিশা রাতে
জাগে তাই তরঙ্গের সংঘাতে সংঘাতে
কেনার স্তবক নীরে
বেলনার অনাদি সঙ্গীত
অতলের অশান্ত সংলাপে—
মৃত্যুর সুরভি মাত প্রোজ্জ্বির গোলাপে
আমার সহস্র গ্লানি কলাপের বর্ণাঢ্য পাখায়—
দীপ জ্বেলে হয় লীন
উদ্বেলিত ঢেউয়ের কণায়।*

---

* এবারের অভেদ-উৎসবে সুধী সম্মেলনে কবি কর্তৃক পঠিত।

আগমনী ও বিজয়া

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

। আট ।

মহেশ্বর ভোলা তোমায় মিনতি চরণে,
যাবার কথা ব'লো না এই মিলন-লগনে।
কটামাত্র দিন এসেছি, আনন্দে দুখ ভুলে গেছি,
বাপ-মায়েরে কাছে পেয়ে পরম-মিলনে ॥

সারা বছর ছিলাম ভালো কৈলাসেতে ঘুরে,
বিরহ শিব বেড়ে গেল এসে গিরিপুরে।
পূরিল না মন-আশা, গেল না তো ব্যথা ভাষা,
নেমে এলো এরই মাঝে আঁধার জীবনে ॥

। নয় ।

সপ্তমীতে ছিলাম ভালো গিরিপুরে এসে,
এসেছিল আমার কাছে সবাই ভালোবেসে।
মা মেনকা জয়দুর্গা, দেখে মোরে মহাসুখী,
মহানন্দে পিতা গিরি উঠেছিল হেসে।

অষ্টমী নবমী আমি ছিলাম সেথা ভালো,
কাঁদাতে সবারে এলো দশমী সকাল।
আলোকিত সে নগরী, অন্ধকারে গেল ভরি,
কতনা বেদনা দিয়ে এলাম চলে শেষে ॥

। দশ ।

একটুখানি দাঁড়াও ভোলা চেয়ে দেখি নয়ন-ভ'রে।
দেখতে আমি পাব না আর এ সব কিছু সৎসরে।
এখনো ধূপ, দীপ জ্বলে, মঙ্গলঘট পূর্ণ ফলে,
সুসজ্জিত প্রতি কক্ষ, নতে রক্ত বস্ত্র ওড়ে।

বিসর্জন দিয়ে মোরে গিরিপুর অধিবাসী,
ভুলে যেতে মোর বিরহ, কোলাকুলি করে আসি।
মা মেনকা পিতা গিরি, হাহাকারে বক্ষ চিরি,
ভাসে সদা আঁখি-নীরে ধরণী উপরে পড়ে।

। এগার ।

বোধনেতে যখন আমি গেলাম গিরিপুরে,
ছুটে এলো পুরবাসী দেখে মোরে দূরে।
বিরহ-বেদনা যত, আঁখি-নীরে হ'ল গত,
সুসজ্জিত সারা পুরী নেহারিনু ঘুরে ॥

ষষ্ঠীতে মুখর করি শারদ-আকাশ,
গিরিপুর মাঝে হ'ল আমার অধিবাস।
জননী মোর চিরসুখী, পেয়ে আমায় হ'ল সুখী,
উল্লাসেতে পিতার মুখে ফুটেছিল হাস।

সপ্তমী ও অষ্টমীতে সব পুরবাসী,
দিবারাত্রি আত্মহারা আমায় দেখে আসি
রাঙা জবা পদ্মফুলে, অর্ঘ্য দিয়ে পদমূলে,
মহানন্দে দু'হাত তুলে উঠেছিল নাচি।

মধুর নবমী নিশি হেসে গেল চলে,
দশমী অরুণ ওঠে উদয়-অচলে।
নিঠুর সে হেরি তিথি, নয়ন-সলিলে তিতি,
চ'লে যেতে হবে মোরে কাঁদায়ে সকলে।

অয়ি বিশ্বময়ী জগৎজননী

কিশোরীরঞ্জন দাশ।

অন্তরের ধ্যানমূর্তি অয়ি মাতা, পরমা প্রকৃতি,
ভারতের সাধ্বী সতী, তুমি মা আদ্যাশক্তি।
নহ শুধু বঙ্গবালা, শ্যামার নন্দিনী,
রামেচন্দ্র-কন্যা নহ, মাগো তুমি জগৎজননী।

সারদা শারদলক্ষ্মী, তুমি বেদমাতা,
ষোড়শী কালিকা পূজে রামকৃষ্ণ পিতা।
আনন্দময়ী মা সিদ্ধি, বিশ্বের জননী,
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দাও, হে সারদামণি॥

বিশ্বের জাগৃতিমূলে মাতৃমন্ত্র ওঠে,
চরণ-বন্দনা ছলে যদি শুধু লোটে;
বিশ্বে নারী জয়ী আজ তোমার আশিসে,
স্নেহে-প্রেমে কল্যাণী সে সর্বজয় নামে॥

প্রসন্ন হাসির আভা বিশ্ব চরাচরে,
তোমার মাধুর্য মাগো, নিত্য স্নেহ ঝরে।
আকাশ-বাতাস স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহে সদা,
ফুল ফোটে পাখী গায়, বরদা সারদা॥

বিবেক-অভেদানন্দ মায়ের পরশে
ধন্য করে বিশ্বজনে, স্বরূপ প্রকাশে।
ধরাধাম ধন্য করি বিশ্বময়ী তুমি,
অভয়া মা কোলে নাও, অকিঞ্চন নমি॥

মমতা-সুরভি মাগো মর্তে প্রকটিতা,
বেদনা বিহ্বল তুমি, স্নেহময়ী মাতা।
করুণার প্রতিমূর্তি, সন্তান পালিনী,
সর্বার্থসাধিকে গৌরী, শিবের গেহিনী॥

---

* সিউড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে জননী সারদেশ্বরীর পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে ৩।১।৭৮ (ইং) তারিখ সন্ধ্যায় সুধী-সম্মেলনে কবি কর্তৃক পঠিত।

তুলসী তলে

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন মালাকার

তুলসী তলে প্রদীপ জ্বলে,
রাম-কৃষ্ণ রাম-কৃষ্ণ বলে,
এমন ছেলে নাইকো মিলে—
আসল ধরার, নামটি বিলে।

ভোরের আলোয় গাইছে গান,
দুঃখে সুখে দীনের প্রাণ।
এসেছে দেবতা সৃষ্টি-উর্ধ্বে,
বিশ্ব জিতিল, নাহি বা যুদ্ধে।

দেবতা তুমি, মোদের শিব—
তব প্রেমগান গাহিছে জীব।
মোদের কৃষ্ণ বিবেকানন্দ,
তুমি হে রাম সচ্চিদানন্দ।

বন্যা ত্রাণ কার্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে ত্রাণ ও সেবাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে এবং সমস্ত সামর্থ্য নিয়োগ করে বন্যার প্রথম দিন থেকে আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ ও কর্মীবৃন্দ স্থানীয় লোকের সহযোগিতায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে নেমে পড়েন। মেদিনীপুরে দাসপুর এলাকায়, মুর্শিদাবাদে কান্দী অঞ্চলে, ২৪ পরগণার বরানগর, আলমবাজারে এবং বীরভূমের কোটাশ্বর, জয়দেব, কুণ্ডলা, বরদাসোল, ও সিউড়ী সাঁইথিয়ার নিকটস্থ বহু অঞ্চলে ৪০টিরও বেশী কেন্দ্র থেকে দৈনিক ৪০,০০০ এরও বেশী বন্যার্তকে রান্নাকরা খিচুরী খাওয়ানো হয়। কিছু কেন্দ্রে এখনো এই সেবাকার্য চলছে। কিছু কেন্দ্র থেকে শুকনো চাল ডাল দেওয়ার কাজও চলছে। এছাড়া বন্যার্তদের মধ্যে ১০,০০০ পিস্ জামা কাপড়, এবং দুধ, গুড়, চিড়া, গুড় প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ও স্থানীয় মহানুভব মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায় এই সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চলছে। এখন শীত এসে পড়েছে। সর্বহারা বিপন্ন নিরাশ্রয় মানুষের জন্য এখন আশু প্রয়োজন পরিধেয় বস্ত্র কম্বল ত্রিপল ও ঘর তৈরী করার একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আশ্রম পক্ষ থেকে এসকল দ্রব্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। এখন এই সেবাকার্য চালিয়ে যাবার জন্য একান্ত প্রয়োজন সর্বসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য। আশ্রম প্রেসিডেন্ট স্বামী নির্বেদানন্দজী এই মর্মে ১০ই নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি আবেদনও জানিয়েছেন। আপনারাও আশ্রমের ত্রাণ ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করে সেবাকার্য চালিয়ে যেতে সহায়তা করুন। চেক্ বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট SREE SREE RAMKRISHNA ASHRAM এই নামে পাঠাতে হবে। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
২নং রামকৃষ্ণ সাহা, লেন
বরানগর, কলিকাতা—৭০০০৩৬

শোক সংবাদ

● বীরভূমের বাতিকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসিনী শক্তিপুরী মাতা গত ভাদ্র ৮৫ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ-সত্যানন্দলোকে মহাপ্রয়াণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের কৃপাপ্রাপ্ত শক্তিপুরী মাতার সন্ন্যাসদীক্ষাও হয়েছিল ঠাকুরের কাছেই। ঠাকুরের কাছে কৃপালাভের পর প্রথমে বরানগর আশ্রমে তারপর ঠাকুরের নির্দেশে কিছুদিন দুবরাজপুর আশ্রমে থাকার পর বাতিকারে তিনি স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। যখন যে আশ্রমে থেকেছেন সেখানেই তিনি ভোগরান্না ও সেবা পূজাদি নানা কর্মভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেছেন। আশ্রমের শত কর্মের মাঝেও অপধ্যান উপবাসাদি কঠোর তপস্যাময় অধ্যাত্মসাধনার দীপটী তিনি রেখেছিলেন চির অনির্বাণ। কর্মের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর সত্যানন্দময় দিব্যজীবনে। আশ্রমিক ও ভক্তসাধারণ সকলের অন্তরেই তিনি একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসন পেতেছিলেন। তাঁর আত্মা সত্যানন্দ চরণে মহাশান্তিময় পরমাশ্রয় লাভ করুক এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে।

● গত ৬ই নভেম্বর ৭৮ সকাল ৬-৩০ মিঃ সিউড়ী ভাদালপাড়া নিবাসী ডাঃ সুরথ চন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রণব চৌধুরী সিউড়ীতে হার্টফেল করে পরলোক গমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। নরসিংহপুর (রাসবনে) শ্রীশ্রীঠাকুরের বিসর্জনীয় তীরে কটোটি তিনিই প্রথম তুলেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ী আসর-ডাঙ্গায় বাস করতেন। সম্প্রতি হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্যে সিউড়ীতে দাদার কাছে এসেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮। তিনি স্ত্রী, পাঁচ কন্যা ও তিনটি পুত্র রেখে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

GESTALT PSYCHOLOGY

Kohler :

According to Kohler, behaviourism is less wide than Gestalt Psychology. The behaviourist does not take account of the context of human experience.

According to him, whenever we experience something the experienced order in space is always structurally identical with the functional order in the distribution of the brain process. Again experienced order in time is always structurally identical with functional order in the sequence of correlated brain processes. In his opinion the subjective statement may be taken as indication of experience or a process that underlies these experiences.

After criticising behaviourism he criticises introspection. He says that introspectionists do not accept that psychology is a young science and that its future rests on new discoveries. They are mistaken in taking negative attitude when observations do not agree with established truths.

Dynamics as opposed to Machine Theory :

He thinks against the introspectionism and behaviourism that the organism responds to the pattern of stimuli rather than to local stimuli by local and independent events. This explains that with a constant local stimulus—local experience varies when the surrounding stimulation varies.

Young science tends to suppose special constraints on nature to stop chaotic behaviours. Aristotelians wanted to stop the possibility of a stone running wild by fixing it on a rigid crystal sphere and deities are accepted as engineers to keep the machine in working order. But Galilio made it less rigid. For Descartes the orderly play of the organism was due to arrangements, connections and channels.

In physical system, events are guided by two factors. One is dynamic determinants which are forces inherent in the processes and the others are topographical factors which are characteristics of the system that are restrict conditions But systems vary as to limiting topographical conditions and the dynamic feature. In a conducting network the electrostatic forces are the dynamic phases while the geometrical pattern and the chemical constituent of network are its topographical conditions.

According to him, different systems differ as to relative influence of limiting topographical conditions on the one hand and dynamic factors on the other.

Introspectionists and behaviourists accept machine type of function.

Just as a train remains on the track because of the railroad, so order in association and recall depends no the pathways.

All orderly psychological phenomena are either inherited machine arrangements or acquired constraints.

According to the author, we actually perceive firstly specific entities and also groups in which those entities are members. Thus the content of certain area is unified and at the same time relatively segregated from its environment.

Sensory Organisation :

The visual fields have two orders. The one is the order in which the machine theory wants to explain a given process that keeps its right place between its neighbours. The second is the field in which the contents belong together as circumscribed units from which the surroundings are excluded.

In Wertheimer's opinion experienced time has some common characteristics with experienced space. Temporal dots form temporal groups as simultaneously given dots form groups in space. The same is the case with hearing and touch. Again factors on which grouping depends, are the same as those on which it depends in space.

Organised processes alter conditions of their medium as the middle position is shifted when the lines on the side are made different.

John Milton : The Defender of Liberty of Thought and Speech

Shailendra Nath Chakraverty

John Milton is well known all over the educated and literary world as a great poet ; but few people knows him as the lover and defender of liberty—particularly liberty of thought and expression. Undoubtedly Milton owes his position primarily to his genius as a poet, but some of his fame is also due to the virile personality which made raise his voice against all kinds of oppressions and injustices of his time. He looked down upon all sorts of tyranny and "blew his soul animating strains," though, "Alas ! too few," against corruption and injustice in society as well as in the government. It is interesting to study here, though very briefly, Milton's view of liberty of thought and expression. It is equally interesting to note how more than three hundred years back, a great poet of England reacted against the censorship of the press and suppression of free thinking. What Milton said and argued against the censorship during his life time is still valid since it was a challenge to the authorities who wanted to deprive the people of their fundamental right of thinking and speaking freely.

To a student of English literature it is well known that Milton was a prolific pamphleteer. His idea of liberty of thought and expression is contained in a pamphlet known *Areopagitica*. On June 14, 1643, the Ordinance of printing was passed, and, the press was

brought under the strict control of a set of presbyterian censors. Milton resented and challenged the Ordinance. He published his first *Divorce Tract* and re-edited it without a license. Herbert Palmer preached against it and the Stationer's Company petitioned Parliament to take necessary action against Milton. Although a committee was appointed to go into the matter but no action seemed to have been taken against him. Now Milton's mind turned seriously to the liberation of the press. He felt that it was unfair to entrust to a few men of little capacity the responsibility of deciding the fate of books. As a protest against such injustice and in vindication of his plea for the liberty of the press he wrote *Areopagitica*. It was published on November 24, 1644, unlicensed and unregistered.

Liberty is the nurse of wit, and the greatest of liberties is the liberty to know, to argue and speak freely. In Milton's opinion inward liberty is the condition of true outward liberty. He wrote in the *Second Defence* with conviction. "Real and substantial liberty is to be sought from within than from without : it's existence depends not so much on the terror of the sword, as in sobriety of conduct and integrity of life." Though a lover of liberty Milton did not encourage licensousness. He was against all lawlessness and irresponsible activities. Without virtue liberty is licence—"Licence they mean when they cry liberty," as he said in the *Second Sonnet*. Again, in the *Tetrachordon* he said : "Men of most renowned virtue have sometimes, by transgressing, most truly kept the law." Truth and Virtue are bedrock on which, Milton held, true liberty is founded. He, therefore, adored and worshipped the Trinity—Truth, Virtue and Liberty throughout his life.

Although the theme of *Areopagitica* proceeds from a personal cause and grievance, it has gained a universal appeal because whenever the voice of the press or the people of a country is strangled by an unscrupulous government, Milton's thundering voice is still heard as a challenge against such tyranny. Milton was one of England's earliest democrats and he admired the doctrine of individual freedom and development. The puritan-republican impulse arose with a defiance of the doctrine of Divine Right of Kings. Milton thought it a divine Right for each man to think, speak and act for himself.

Milton's *Areopagitica* is, in fact, an unspoken oration. He had Isocrates in his mind while writing it. The address of Isocrates was a plea for the Areopagus of his day ; Milton's plea is to the Areopagus of his age. Isocrates wrote in the interest of a conservative and obsolescent Areopagus : Milton writes to an Areopagus whom he accuses of too much conservatism in the matter of liberty of thought and expression. Both Isocrates and Milton were defenders of liberty and yet they could love a dictator. Before *Areopagiticus Logas* Isocrates praised Philip of Macedon and wanted to unite all the Greeks under him while after his *Areopagitica*, Milton adored Cromwell and wished all England to rally round him. However, in spite of his love for Cromwell, Milton supported wholeheartedly free thinking in England.

Milton, in the *Exordium* in *Areopagitica* pays a rich tribute to Parliament and then he tells the audience that he makes his speech in defence of civil liberty and he further expresses his confidence in the uprightness, reasonableness and love of truth of Parliament.

Milton's defence of free thinking and expression occurs in the *Argument* in *Areopagitica*. In his historical review of censorship Milton proves that censorship was not

known in Athens, Sparta and Rome in the Roman Empire when it became Christian and that it arose only after 800 A. D. when the Pope introduced it with the Inquisition. Citing the examples of Paul, Jerome and Eusedius, Milton says that they supported and appreciated classical studies and general knowledge. The better part of Milton's argument comes when he dwells upon the question of eradicating evil by suppression as the censorship aims at. Evil begets evil. In this world, Milton holds, good is intermixed with evil, and truth and virtue are not possible without knowledge of heresy and vice. He says : "Good and evil we know in the field of this world grow up together almost inseparably : and the knowledge of good is so involved and interwoven with the knowledge of evil." And so they are very difficult to discern. Vice cannot be removed by proscribing books only since vice enters in a hundred ways. In Milton's opinion a virtuous person will remain virtuous even in the midst of temptations : "To the pure, all things are pure ; not only meats and drinks, but all kind of knowledge whether good or evil ; the knowledge cannot defile nor consequently the books, if the will and conscience be not defiled."

The idea of improving the morals of the people by clogging the current of thought and choking the voice of conscience is absurd. Milton, in *Arcopagitica* tells us that books were proscribed by the Inquisition in Spain and Italy but it did not improve the morals of these countries. If we expel sin by suppressing it, Milton argues, we also expel a certain amount of virtue : "They are not skilful considerers of human things who imagine to remove sin by removing the matter of sin." He further says that when God created man He gave him the power of choosing. Man is not only a social but a rational creature too ! "Many there be that complain of Divine Providence for suffering Adam to transgress. Foolish tongues ! When God gave him reason He gave him freedom to choose for reason is but choosing," avers Milton.

In Milton's opinion not only the censorship is ridiculous it is actually pernicious. It produces more evil than good. It will teach lazy habits to the leaders as well as the public. They will cease to think for themselves. A reign of dull mediocrity will follow. What would happen to the intellectuals of the country ? They cannot be treated as school boys. For all this, vicious and biased writings will multiply and good writings will be punished. A book written under compulsion and an official order is as lifeless as a dead body. Milton in his plea, reminds Parliament of the truth that books are not merely inanimate things. "Books are not absolutely dead things," declares Milton, "but do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whose progency they are" He thinks that to destroy a good book is to kill a man. It is as heinous a crime as a homicide. Hence his bold rejoinder : "—who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book, kills the image of God, as it were in the eye." "Man does not live by bread alone," said Jesus Christ. Yes, mental food is equally important for man. A good book is the elixir of life. Hence Milton's famous comment : "A good book is the precious life-blood of a master spirit, embalmed and treasured upon purpose to a life beyond life."

A nation lives not in its politicians, rulers or soldiers, but in its prophets, seers, poets, authors, and above all, intellectuals. Who lives if the Voice of Truth, Wisdom and Conscience

is choked by a few overambitious persons ? These so-called custodians of a country do not read the writing of the wall and forget the fact that the weapon they use against the people may come back to them like a boomerang and destroy them completely. There is no escape from Nemesis !

In the grand *Peroration* in *Areopagitica*, Milton gives us the glorious vision of England —"a city of refuge, the mansion house of Liberty" upon which he builds his hopes and expectations. Milton, again, visualizes the bright future of England in these immortal words : "Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks. Methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth, and kindling her undazzled eyes at the full midday beam, purging and unscaling her long-abused sight at the fountain itself of heavenly radiance, while the whole noise of timorous and flocking birds, with those also that love the twilight, flutter about, amazed at what she means, and in their envious gabble would prognosticate a year of sects and schisms." Milton, like Swami Vivekananda and Sri Aurobindo in our country, felt a great pride in his country's glorious past, upheld the cause of liberty in every sphere of life and, at the same time, was confident of a prosperous and bright future.

What interests us here is the extraordinary display of independence in Milton's character as well as his writings. "I did prompt the age to quit their clogs," he said. Liberty in Milton is an aspiration for a new order of things—"an order in which the old injustices and oppressions should cease." And assuredly it is the aspiration for a cleaner, juster and nobler life that feeds the fire of Milton's passion. And nothing can be fuller or more explicit than his demand : "Give me the liberty to know and to argue freely, according to my conscience, above all liberties."

Well, is it not the demand of every citizen of a democratic country today ?

"If you ask of Him in right earnest, rightly would you receive. Thakur will make proper adjustments according to circumstances.
But you would have to be pure and must continue the Nama. Remember, it is not for your sake alone. An abiding impression has to be left. You are associated with the welfare of many, if the ideal be high you will not slip down easily."

Vedachhanda—Sree Thakur Satyanandadeva

(*Translated by S. N. Sanyal*)

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA - 22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

WORLD PHILOSOPHY

by

Swami Satyananda

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M. A., Ph. D.

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৩ হইতে প্রকাশিত ও বসুধা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৯ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৩৪-২৮৮১)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী ঈশানন্দ

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য ডাঃ ৮·০০

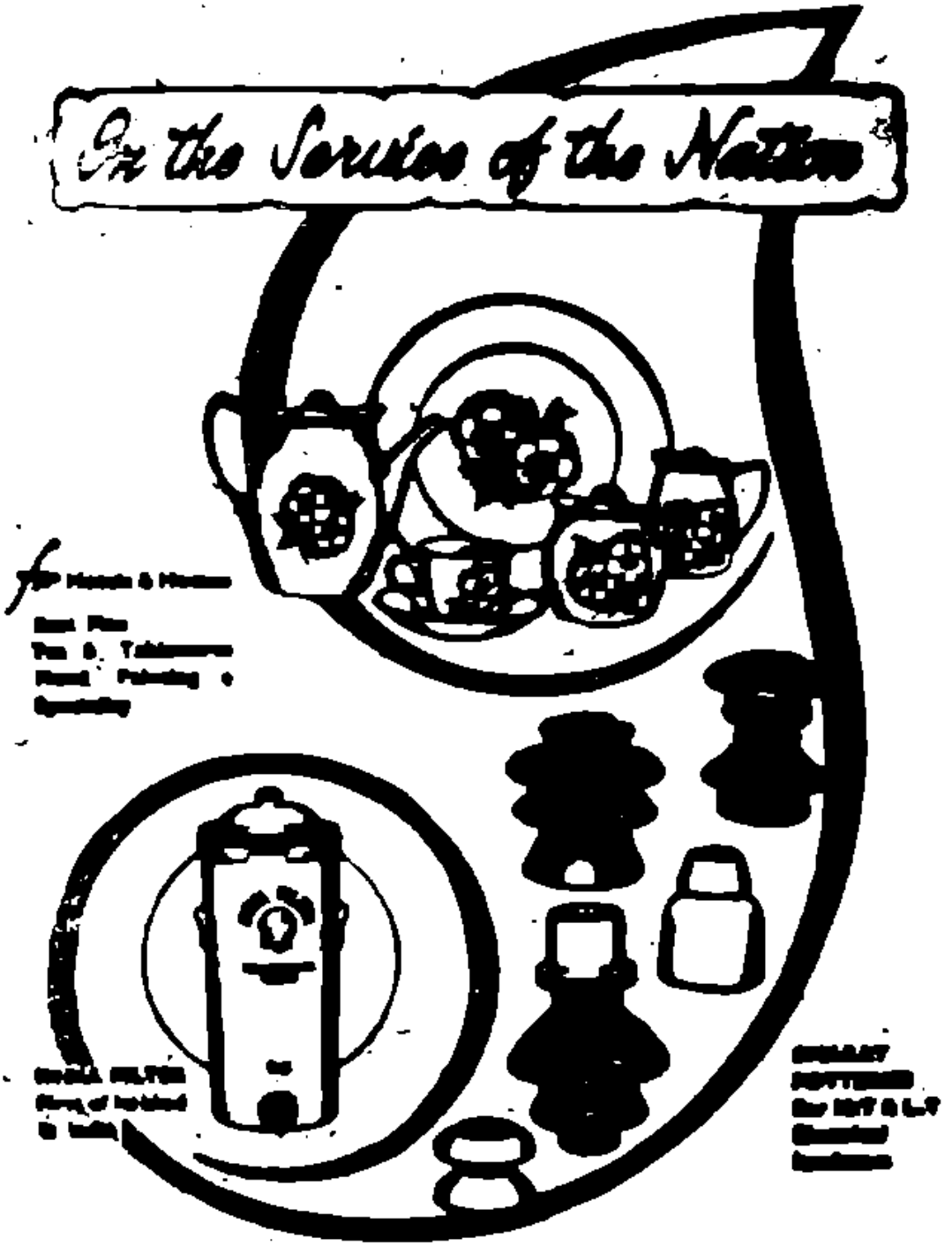

INDIA POTTERIES LIMITED

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

এই পত্রিকায় প্রকাশিত রঙীন ছবিটি [illegible] ভাবমন্ত্রাধি।

[illegible]—শ্রীইন্দু রায়। [illegible] স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। মুদ্রণ-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও চন্দ্রের সমাজ [illegible] প্রকাশক—স্বামী ঈশানন্দ ও স্বামী মুগানন্দ। এজেন্ট—স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী [illegible] স্বামী অমলানন্দ ও ব্রঃ তারক চৈতন্য।